

স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু।

(৩২৪ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

আনন্দমোহনের পঠদ্দশাতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বিধবা মাতা উমাকিশোরীর প্রতি তিন পুত্রের রক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতির ভার পড়ে। তিনি সে ভার সমুচিতরূপেই বহন করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণা নারীর একদিকে যেমন সন্তানদিগের প্রতি প্রগাঢ় বাৎসল্য ছিল, অপর দিকে তেমনি তাহাদের চরিত্রের প্রতি প্রখর দৃষ্টি এবং শাসনশক্তিও প্রচুর ছিল। ফলতঃ এই সময় হইতে তিনি কি রূপে একদিকে দক্ষতার সহিত আপনার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অপর দিকে সন্তানগণের রক্ষা ও শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাহা যখন শ্রবণ করা যায় তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনে হয় এই সকল রমণী যদি সমুচিত শিক্ষা ও কার্য্য করিবার সুবিধা লাভ করিতেন তাহা হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে এক একটী শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়া দেশের কি মহোপকারই সাধন করিতে পারিতেন।

ধর্ম্ম-পরায়ণতা আনন্দমোহনের মাতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহার পতির মৃত্যুর পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁহার পতির স্মৃতিকে হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থানে ধারণ করিয়াছিলেন। সামান্য কথোপকথনে যদি কেহ তাঁহার স্বর্গীয় পতির নাম উচ্চারণ করিত, উমাকিশোরী তৎক্ষণাৎ বক্তাকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইতে বলিতেন; দুই কর যোড় করিয়া নিজ শিরে ধারণ করিতেন; এবং উদ্দেশে স্বর্গীয় কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে অবশিষ্ট কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এরূপ অসামান্য পতিভক্তি কয়জন স্ত্রীলোকে দেখিতে পাওয়া যায়! তৎপরে তাঁহার বংশধরদিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁর সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে তিনি গাড়ি করিয়া পথে যাইবার সময় যদি শুনিতে পাইতেন যে পথপার্শ্বে একজন মুসলমান পীরের গোর রহিয়াছে, তাহা হইলে কখনই তাহার সম্মুখ দিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া যাইতেন না, গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া গলবস্ত্রে সেই গোর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অপর দিকে গিয়া গাড়িতে উঠিতেন। সঙ্গের বালক বালিকারা হাসিয়া বলিত "ঠাকুর মা ওকি, ওযে মুসলমান পীর, তুমি যে হিন্দুর মেয়ে" তখন তিনি বলিতেন—"সাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি রে"? আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাঁহার তিন পুত্রই এই সাধুভক্তি ও উদারতা প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। আর একটী ঘটনা আমাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে। একবার 'সার জন লরেন্স' নামক এক জাহাজে অনেক

গুলি জগন্নাথের যাত্রী পুরীতে যাইতেছিল। বঙ্গোপসাগরের মুখে ঝড় হইয়া ঐ জাহাজ জলমগ্ন হয়। সেই জাহাজে বসুজ মহাশয়ের মাতার যাইবার কথা ছিল, কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ যাওয়া হয় নাই। তাঁহার পৌত্র পৌত্রীরা যখন গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিল, বলিতে লাগিল—"ঠাকুর মা ভাগ্যে তুমি সে জাহাজে যাও নাই, জাহাজ ডুবে এত লোক মরেছে।" তখন সেই সংবাদ শুনিয়া আনন্দ না করিয়া উমাকিশোরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—"হায় না জানি আমার পূর্ব্বজন্মের কি পাপই আছে। আমি কেন সে জাহাজে থাকিলাম না? জগন্নাথের পথে যাদের প্রাণ যায় তারা ত ধন্য।"

বলিতে গেলে শৈশব হইতেই আনন্দমোহন এই সাধুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কোনও সৎ বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলেই পিপীলিকা যেরূপ মধুবিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তিনি সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেন; এবং ধর্ম্মের বিধিব্যবস্থা সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেন।

যেমন একদিকে ধর্ম্মানুরাগ তেমনি অপর দিকে আশ্চর্য্য প্রতিভা। পাঠে অত্যল্প বালকেরই এ প্রকার অভিনিবেশ দেখা যাইত। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন নয় বৎসরের অধিক হইবে না তখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া চারি টাকা বৃত্তি পাইলেন; পাইয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ১৮ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; সেজন্য গোলমালে তাঁহার পরীক্ষার পূর্ব্বে তিন মাস পড়া হয় নাই; তথাপি এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে বা ইহার কিছু পরে প্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজে আসেন; এবং এখানে এল-এ, বি-এ, এম-এ প্রভৃতি সমুদয় পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিতে থাকেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও পারিতোষিকাদি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

ময়মনসিংহে থাকিতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মদিগের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কলিকাতাতে আসিয়া অপরাপর যুবকের ন্যায় তিনিও কেশবচন্দ্রের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন;

এবং ১৮৬৯ সালে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অপর কতিপয় বন্ধুর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি এঞ্জিনিয়ারিং কালেজে অঙ্কশাস্ত্রের প্রোফেসারের কর্ম্ম পান। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন; এবং সেই বৃত্তির টাকা বৃথা ব্যবহার না করিয়া ইংলণ্ডগমনে ও নিজ শিক্ষার উন্নতিবিধানে নিয়োগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন।

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন বিলাতযাত্রা করেন, তখন আনন্দমোহন তাঁহার সমভিব্যাহারী হন। ১৮৭৪ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকার সর্ব্বোচ্চ র‍্যাঙ্গলার উপাধি লাভ করেন। সেখানে বাসকালে তিনি যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন তাহা নহে। ভলন্টিয়ার দলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন; ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির সহিত মিলিয়া ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন; সভাসমিতিতে রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতাদি করিতেন; সুরাপাননিবারিণী সভার সহিত যোগ দিয়া সুরাপানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতেন; এবং সর্ব্বপ্রকারে আপনার হৃদয় মনের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত থাকিতেন।

১৮৭৪ সালে তিনি বারিষ্টারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখেন, ব্রাহ্মসমাজে আবার সমর-দুন্দুভি বাজিতেছে। স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন ও সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের আন্দোলন উঠিয়াছে। কিন্তু ওদিকে যুবকদলের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি হ্রাস হইতেছে। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃত্ব হইতে অবসৃত হইয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি লইয়া একান্তে সরিয়া পড়িতেছেন। বসুজ মহাশয় এই অবস্থাতে প্রথমে ছাত্রদলকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ছাত্রদিগের জন্য একটী সভা স্থাপন করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহাদের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত হইলেন। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয় ও নিয়মতন্ত্র-পক্ষীয় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত উভয় বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার ও স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের সাহায্যে স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষীয়গণের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ভারতমহিলা-বিদ্যালয় পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয় নাম ধারণ করিল, এবং মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইল। এই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় পরে বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া বেথুন কালেজ রূপে পরিণত হয়।

এই ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়া কলিকাতাতে আসিলেন; এবং আনন্দমোহনের সহিত মিলিত হইয়া রাজনীতি চর্চ্চাতে নিমগ্ন হইলেন। সেই চর্চ্চার ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা Indian Association) স্থাপিত হইল। আনন্দমোহন তাহার প্রথম সেক্রেটারি হইলেন; এবং বহুদিন সেক্রেটারি ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন, ও নিয়মতন্ত্র-প্রণালী স্থাপনের আন্দোলন থাকিয়া উঠিতে না উঠিতে ১৮৭৮ সালের মার্চ্চ মাসে সুপ্রসিদ্ধ কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া গেল, এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া দুইভাগ হইয়া গেল। স্ত্রীস্বাধীনতার দল, নিয়মতন্ত্রের দল, ও কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদকারী দল, তিন দল মিলিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন।

যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, তাঁহারা আনন্দমোহনকে সারথি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি হইলেন। তৎপরে ইহার কার্য্যে তাঁহার যে প্রকার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম দেখা গেল তাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মানুষে কি এত খাটিতে পারে? ইহার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে চিন্তা ও বিচার করিতে করিতে এক এক দিন রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাইত, আমরা আর বসিতে পারিতাম না, কিন্তু আনন্দমোহনের শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না। আমরা দেখিতাম ইহার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি আপনার বারিষ্টারি ও ধনাগমের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহা না হইলে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে, ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে তিনি বারিষ্টারির দ্বারা দেশের ধনীদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন।

ইহার পরে শিক্ষা বিভাগে তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইল। ১৮৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সেনেটের একজন ফেলোরূপে বরণ করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হইতে সিণ্ডিকেটে গেলেন। সিণ্ডিকেটের মেম্বররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষয়ে সহায়তা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিলেন না। ১৮৭৯ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত মিলিয়া তিনি সিটীস্কুল নামে একটী স্কুল স্থাপন করিলেন। ঐ স্কুল ক্রমে সহরের একটী প্রধান কালেজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বসুজ মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ঐ কালেজের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।

ইহার কার্য্যে তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে পুনার ফার্গুসন কালেজের ভ্রাতৃমণ্ডলীর ন্যায় একটী ত্যাগশীল ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করিয়া, তাঁহাদের হাতে কালেজটী দিয়া যান; কিন্তু ঐ কালেজ-সংস্পৃষ্ট বন্ধুগণের প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; অবশেষে কালেজটী ট্রষ্টডীড্ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৪ সালে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড রিপনের বিশেষ অনুরোধে তিনি এডুকেশন কমিশনের সভ্য হন; এবং তাহার কার্য্য সমাধা করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি রূপে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে প্রেরণ করেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত সভার সভ্যরূপে মনোনীত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনাররূপেও মনোনীত হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ কিরূপে একজন মানুষ এত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম যে যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন, সিটীকালেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে পরিশ্রম করিতেছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে নূতন আইন প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেছেন, ভারতসভাতে রাজনীতির চিন্তা করিতেছেন, তখন আবার বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া দেশের দুর্নীতি ও সুরাপান নিবারণের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। মেট্রপলিটান টেম্পারেন্স ও পিউরিটী এসোসিএশানের তিনি সভাপতি ছিলেন। সুরাপান নিবারণ বিষয়ে যত্ন চেষ্টা তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে করিয়া আসিয়াছেন। পঠদ্দশায় ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার সুরাপান নিবারিণী সভার সভ্যগণের সহিত মিলিয়া কাজ করিয়াছেন; এখানে প্যারীচাদ সরকার ও কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত মিলিয়া সুরাপান নিবারণের জন্য খাটিয়াছেন; এবং শেষদশাতে দেহে যত দিন শক্তি থাকিয়াছে, ততদিন ঐক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াছেন।

রাজনীতি বিভাগেও তাঁহার কার্য্য বড় অল্প ছিল না। অগ্রেই বলিয়াছি পঠদ্দশাতে ইংলণ্ডে গিয়া উদার-নৈতিক ও ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির সহিত মিশিয়া রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিলেন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই; তাই উদ্যোগী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত একযোগে ১৮৭৬ সালে ভারত সভা স্থাপন করিলেন। ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে। তিনি

প্রথম কয়েক বৎসর ভারতসভার পরামর্শদাতা, নির্ব্বাহকর্ত্তা, তত্ত্বাবধায়ক সকলি ছিলেন। পরে অপরেরা তাহাতে যোগ দিলে এবং কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, তিনি কমিটীতে থাকিয়া চিরদিন ইহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। ন্যাসনাল কংগ্রেসের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহার সকল পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন; এবং একবার মান্দ্রাজ অধিবেশনে ইহার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

এ সকল বলিলেও তিনি কিরূপ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাহা বলা হইল না। তিনি যখনি যে স্থানে যে অবস্থাতে থাকিয়াছেন, স্বদেশের হিত-চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিয়াছে।

১৮৯৭।১৮৯৮ সালে তাঁহার দুই পুত্রকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। তখন বন্ধুজনের পরামর্শে তিনিও স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যের জন্য গেলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়া তাঁহার স্বদেশ-প্রেম তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না। তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া নানা সভাসমিতিতে ভারতের দুঃখের কাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; এবং এদেশের প্রতি ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞগণের ও ইংরাজজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে সেই গুরুতর শ্রমেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে দেশবাসিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য টাউনহলে এক সভা করিলেন। সেই সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন কাল শত্রু ধরিয়াছে। সেই যে কি এক রোগে দেখা দিল, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ গেল। মধ্যে মধ্যে অচৈতন্য হইতেন; এবং কোনও বিষয়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবিতে ও খাটিতে পারিতেন না। চিকিৎসকগণ ও পরিবারবর্গ তাঁহাকে চিন্তা ও শ্রম হইতে দূরে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? যে মানুষ চিরদিন আত্মচিন্তা ভুলিয়া স্বদেশের হিত-চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে কি সম্পূর্ণ নিবারণ করিয়া রাখা যায়! ১৯০৫ সালে ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবের সময় তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া প্রায় সমস্ত দিন ব্রহ্মমন্দিরে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মালোচনার মধ্যে যাপন করিতে গেলেন। রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাঁহার দমদমস্থ ভবনে ও কলিকাতার বাসগৃহে ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে এক প্রকার বন্দীদশাতে রাখা হইত; যাহাতে চিত্তের উত্তেজনা হয় এরূপ কথা শোনান

হইত না; এবং ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধব কম সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল! ইহার মধ্যে শেষকীর্ত্তি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বক্তৃতা। বলিতে গেলে এক প্রকার মৃত্যু শয্যা হইতে লোকে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া গেল। কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতে গিয়া যাহা বলিলেন তাহার প্রত্যেক বাক্য অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। মানব-বাক্যের যে এরূপ উন্মাদিনী শক্তি থাকে, লোকে তাহা জানিত না। তিনি কি ভাবে যে ঐ সভাতে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতাতে উচ্চারিত নিম্নলিখিত প্রার্থনা হইতে জানিতে পারা যায়।

প্রার্থনা।

And Thou, Oh God of this Ancient land, the protector and saviour of *Aryavarta* and the Merciful Father of us all, by whatever name we call upon Thee, be with us on this day, and as a father gathereth his children under his arms, do Thou gather us under thy protecting and sanctifying care.

ঐ বক্তৃতান্তে তিনি একটী ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে এই ব্যক্ত হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, যথাসাধ্য সেই অনিষ্ট ফল নিবারণ করিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছেন।

বলিতে গেলে সেই ঘোষণাপত্র হইতেই বঙ্গদেশের মহা রাজনৈতিক আন্দোলন উঠিয়াছে। আমরা সেই তরঙ্গের মধ্যে বাস করিতেছি। ইহার চরম ফল কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও অনুভব করা যাইতেছে না। আনন্দমোহনের ন্যায় পবিত্রচিত্ত, অকপট স্বদেশপ্রেমিক, চিন্তাশীল, ও ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট নেতা এখন কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হইত সন্দেহ নাই।

এই ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপনের পর আনন্দমোহন প্রায় এক বৎসর কাল জীবন্মৃতাবস্থাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাহার মধ্যেও বান্ধবান্ধবের ও পরিবারবর্গের অজ্ঞাতসারে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে লিখিতে ত্রুটী করেন নাই। দেশের যে কল্যাণচিন্তা দিন রাত্রি তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাহা জীবন্মৃতাবস্থাতেও তাঁহাকে ছাড়ে নাই।

অবশেষে ১৯০৭ সালের ২০ আগষ্ট প্রাতে প্রাণবায়ু তাঁহার রুগ্ন ভগ্ন দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ একজন আদর্শ নেতা হারাইল; জননী

জন্মভূমি একজন অকৃত্রিম ভক্ত সেবক হারাইলেন; বঙ্গদেশ একজন প্রতিভাশালী, ধীমান, মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হারাইলেন; এবং আমরা একজন অকপট, উদারচেতা, বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হারাইলাম। দেশের লোক আনন্দমোহনকে বুদ্ধিমান্, যশস্বী, দেশহিতৈষী, সুবক্তা, কেম্ব্রিজ র‍্যাংলার, ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বারিষ্টার বলিয়া জানিতেন, কিন্তু আনন্দমোহনের গৌরব সেখানে নহে। তাঁহার প্রধান মহত্ত্ব ও প্রধান আকর্ষণ তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ছিল। গোপনে, দৈনিক জীবনে, যাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের মূলে এই কথা ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের ন্যস্ত নিধি স্বরূপ, ইহা তাঁহার কার্য্যেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে তাঁহার ভক্তি অশ্রুপ্লাবিত মুখ আমরা কখনই ভুলিব না। তিনি অতি অন্তরতম আত্মীয়দিগের নিকটও আপনার হৃদয়ের গভীরভাব সকল ব্যক্ত করিতে লজ্জা পাইতেন; পরিবার পরিজনবর্গও সকল সময়ে তাহা জানিতে পারিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া সহরের বাহিরে নির্জ্জন স্থানে গমন করিতেন; এবং দিনের পর দিন ঈশ্বর-চিন্তাতে যাপন করিতেন। নিজের দমদমস্থ ভবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠালয়ে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তায় যাপন করিতেন। সে সময়কার চিন্তা সকল মধ্যে মধ্যে আপনার দৈনিক লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই সকল দৈনিক লিপি দেখিয়া আমরা মহোপকার লাভ করিতেছি। এরূপ ধার্ম্মিক গৃহস্থ, কর্ত্তব্যপরায়ণ পতি, সন্তানবৎসল পিতা, অকৃত্রিম মিত্র, বিনীত ও ঈশ্বর-ভক্ত সাধক, ও স্বদেশপ্রেমিক দেশ-সেবক, প্রায় দেখা যায় না। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যজ্ঞানে দৃঢ়তা, ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বর্ণে তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

দুর্গামোহন দাস।

প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর জেলার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙ্গালা ১২৪৮ সালে দুর্গামোহন দাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাশীশ্বর দাস। কাশীশ্বর দাস মহাশয় বরিশালে ওকালতি করিতেন। দুর্গামোহন অল্পবয়সে মাতৃহীন হন। তৎপরে কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িয়া বরিশালে নীত হন। সেখানে ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া জুনিয়ার স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। সেই বৃত্তি পাইয়া

কলিকাতায় হিন্দুকালেজে আসেন ; এবং কলিকাতার উপনগরবর্ত্তী কালীঘাটে তাঁহার পিতৃব্য বীরেশ্বর দাস মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া পড়িতে থাকেন। হিন্দুকালেজে এক বৎসর থাকিয়া তিনি ঢাকাতে প্রেরিত হন। সেখান হইতে সিনিয়ার স্কলার্সিপ পাইয়া আবার কলিকাতায় আসেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন কালে ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড কাউএলের সংশ্রবে আসিয়া ঐ সদাশয় ধার্ম্মিক পুরুষের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কাউএলকে যাঁহারা কখনও একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানী, গুণী, ধার্ম্মিক, সাধু পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল ; এবং সেই কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কাউএল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন ; এবং নিজ ভবনে সমাগত বালকদিগের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। দুর্গামোহনের সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাউএলের বাড়ীতে যাইতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি পরে বহুকাল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে সুশোভিত করিয়া বাস করিয়াছেন ; এবং গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভগবান বাবুর ন্যায় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ও কাউএল মহোদয়ের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন।

দুর্গামোহনের চরিত্রের এই একটা গুণ ছিল যে তিনি যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেন, লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনা করিতেন না। যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মন ঝুঁকিল, তখন সে পথে পদার্পণের পূর্ব্বে স্বীয় বালিকা পত্নী ব্রহ্মময়ীকে লইয়া একজন খ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুর বাড়ীতে তুলিলেন। কারণ পত্নীকে ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জানান চাই, এবং সম্ভব হইলে তাহাতে দীক্ষিত করা চাই। অভিপ্রায় ছিল যে তিনি নিজে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ে আরও কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়া দুই জনে এক সঙ্গে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা ঘটান আর এক। ব্রহ্মময়ীকে খ্রীষ্টীয় পাদরীর বাড়ীতে রাখিতে গিয়া তাঁহাকে স্বীয়

পিতৃব্যের ভবন হইতে তাড়িত হইতে হইল। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল কালীমোহন দাস মহাশয় বরিশালে ওকালতি করিতেন। তিনি তাঁহাকে আশ্রয়হীন জানিয়া বরিশালে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন; এবং তাঁহার হস্তে মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের গ্রন্থগুলি অর্পণ করিয়া তাহা পাঠান্তে খ্রীষ্টান হওয়া বিষয়ে স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দুর্গামোহনের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভ্রম দর্শন করিলেন; এবং পার্কারের প্রদর্শিত উদার, আধ্যাত্মিক, ও সার্ব্বভৌমিক একেশ্বর-বাদ অবলম্বন করিলেন।

ইহা হইতেই তাঁহার চিত্ত ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি বরিশালে গিয়া কিছুদিন পরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য উৎসাহী হইলেন। যে কথা সেই কাজ; যখন কাজ তখন পূরা পূরা কাজ; আধা আধি নহে; এই যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন তখন পূরা পূরি সেই কাজে মন দিলেন। নিজে বন্ধু বান্ধব গণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া, কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাহ্মপ্রচারককে লইয়া গিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তাঁহাদের সাহায্যে ব্রাহ্মগণের পত্নীদিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অচিরকালের মধ্যে বরিশাল ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের একটী কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য বরিশাল বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল। তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নী ব্রহ্মময়ী সকল কার্য্যে তাঁহার সহায় ও উৎসাহদায়িনী হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিন দিন বরিশালে ব্রাহ্মের ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

এই কালের মধ্যে দুর্গামোহন এমন এক কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, যাহা তাঁহার আত্মীয় বন্ধুরা ও অগ্রে সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। এই কালের প্রথম ভাগে পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় স্থানে ও স্বীয় স্বীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন। ঐ স্বাক্ষর-কারীদিগের মধ্যে দুর্গামোহন একজন ছিলেন। অপর স্বাক্ষরকারীরা এবিষয়ে কি করিয়াছেন তাহা জানি না; কিন্তু দুর্গামোহনের যে কথা সেই কাজ। তিনি সংকল্প করিলেন যে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত তাঁহার বিধবা বিমাতার বিবাহ দিবেন।

এই সংকল্প প্রকাশ পাইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিমাতাকে কৌশলে চুরী করিয়া কাশীধামে প্রেরণ করা হইল; এবং দুর্গামোহনের প্রতি কটূক্তি অত্যাচার নির্যাতন চলিতে লাগিল। তিনি সমুদয় সহিয়া রহিলেন। কিন্তু বিমাতা হাতছাড়া হওয়াতে তাঁহার সংকল্প সাধন অসম্ভব জানিয়া সে বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ বন্ধুর প্রতি তাঁর বিমাতার অনুরাগ পূর্ব্বেই অর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি বন্দীদশাতে কাশীতে থাকিয়া, কোনও কৌশলে দুর্গামোহন বাবুকে তাঁহার মনোগত ভাব জানাইলেন। তখন চোরের উপর বাটপাড়ি করিবার পরামর্শ স্থির হইল। অনেক ব্যয় ও অনেক কৌশলে বিমাতাকে কাশী হইতে চুরি করিয়া আনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে, বিবাহ দেওয়া হইল। ও দিকে বরিশাল ও সমস্ত বঙ্গদেশ তোল পাড় হইয়া যাইতে লাগিল। দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তখন তিনি আদালতে যাইবার জন্য বাহির হইলেই রাস্তার লোকে বাপান্ত করিয়া গালি দিত; এবং গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত। কিছু দিনের জন্য তাঁহার পসার একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। এমন কি ছয় মাস কাল গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমা ভিন্ন একটীও বাহিরের মোকদ্দমা পান নাই। এ সকল কষ্ট তিনি হাসিয়া সহ্য করিতেন; একটীও কটূক্তির দ্বিরুক্তি করিতেন না; বরং সময়ে অসময়ে তাঁহার বিরোধিগণের সাহায্যার্থ মুক্ত-হস্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী সকল নির্যাতনের মধ্যে তাঁহার সহায় হইলেন। নির্যাতনের তীব্রতা তাঁহাকে যত সহিতে হইত, দুর্গামোহন বাবুকে বরং ততটা সহিতে হইত না। কারণ দুর্গামোহন বাবু আদালতে যাইতেন; বন্ধুদের সঙ্গে মিশিতেন; লিখিতেন, পড়িতেন, বাহিরের ভাল চর্চ্চাতে থাকিতেন; কিন্তু ব্রহ্মময়ী রাত্রিদিন গৃহ পরিবারে আবদ্ধ থাকিতেন; পাড়ার লোকের সমালোচনা শুনিতেন; এবং আত্মীয়া মহিলাগণের গঞ্জনা সহ্য করিতেন। তথাপি একদিনও তাঁহার মুখ বিষণ্ণ দেখা যাইত না। এই সময়ে তাঁহার স্থির-চিত্ততা দেখিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইত। তিনি সর্ব্বদা স্বীয় পতিকে তাঁহার অভীষ্ট পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার সঙ্গিনী হইতেন। ইঁহারা কি ভাবে বিরোধিগণের অত্যাচার সহ্য করিতেন; এবং সকল সহিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ কিরূপ প্রস্তুত থাকিতেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই সময়কার একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নির্যাতনের সময়ে দুর্গামোহন বাবুর একটী সন্তান

জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার পত্নী যখন শিশু সন্তানের পালনে নিযুক্ত, তখন পার্শ্বের বাড়ীর এক গৃহস্থের পত্নী একটী শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগত হইলেন। সে ভদ্রলোকের অবস্থা মন্দ ছিল; তিনি শিশুপুত্রের রক্ষার ও প্রতিপালনের বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মহাবিপদে পড়িলেন। পুত্রটী মারা যায়, রক্ষার উপায় নাই, এরূপ অবস্থাতে দুর্গামোহন ও ব্রহ্মময়ী তাহা জানিতে পারিয়া শিশুটীর রক্ষার ভার লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সে গৃহের গৃহস্বামী দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিপক্ষগণের মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও ইঁহারা শিশুটীর রক্ষার ভার লইতে চাহিলেন। গৃহস্থ ভদ্রলোকটী যেন বাঁচিয়া গেলেন; শিশুটী দাসগৃহে আসিল। ব্রহ্মময়ী এক পার্শ্বে নিজের সন্তান অপর পার্শ্বে প্রতিবেশীর শিশু পুত্রটী লইয়া স্তনপান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিশুটীর রক্ষা চলিল। দুঃখের বিষয় সেটী অধিক দিন বাঁচে নাই।

বিরোধিগণের প্রতি এইরূপ সদ্ভাব ও সৌজন্য দাস মহাশয়ের চিরদিন ছিল। আমরা চিরদিন দেখিয়াছি সামাজিক নির্যাতন তিনি মনের ত্রিসীমাতে লইতেন না; তাহা অপরিহার্য্য বলিয়া জানিতেন; এবং অম্লানচিত্তে সহ্য করিতেন। তাঁহার উৎসাহ কখনও খর্ব্ব হইত না। নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াই তুষ্ট থাকিতেন, লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনীয় মনে করিতেন না।

এই সময়ের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বরিশালের নব্য যুবকদলের মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে, উন্নতি-স্পৃহা ও সৎসাহস প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছিল। সেই সৎসাহসের নিদর্শনস্বরূপ বরিশালের নিকটস্থ লাখুটিয়া নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায়ের পুত্রগণ এই সময় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া সর্ব্ববিধ উন্নতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাঁহারা একদিন পত্নীসহ স্থানীয় কমিশনর সাহেবের ভবনে আহার করিতে গেলেন। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজের গৃহে খানা খাওয়া দূরে থাক্ বাঙ্গালি সম্ভ্রান্ত ভদ্রগৃহের কুলাঙ্গনারা কোনও দিন অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই। এই অসমসাহসিক কার্য্য করাতে বরিশাল সহর, কেবল বরিশাল কেন সমস্ত বঙ্গদেশ, আন্দোলিত হইয়া যাইতে লাগিল। দাস মহাশয় নির্ভীক অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কেবল ইহাই নহে। ইহার পর বরিশালে দিন দিন বিভিন্ন জাতীয় দিগের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। বরিশাল তপ্ত খোলার মত হইয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে আমরা সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে বরিশালে অসম্ভব সম্ভব

হইতেছে। কলিকাতার ব্রাহ্মগণ সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে দুর্গামোহন দাস মহাশয় হাইকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য কলিকাতাতে আসিলেন। তিনি আসিয়া বসিবামাত্র কলিকাতার সমাজসংস্কারার্থী নব্য ব্রাহ্মদলের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন। তাঁহার ভবন ঐ যুবক-দলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল। তখন "অবলাবান্ধব" সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কাগজ লইয়া কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দ্বারকানাথের পশ্চাতে পরবর্তী সময়ের ডেপুটী কন্ট্রোলার-জেনারেল রজনীনাথ রায় প্রভৃতি একদল যুবক আছেন। ইঁহারা দুর্গামোহন দাসকে পাইয়া, খোঁটার জোরে মেড়ার ন্যায়, বলশালী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।

সে আন্দোলনের ইতিবৃত্ত অগ্রেই দিয়াছি। কেশববাবু ইঁহাদের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে প্রকাশ্যস্থানে মহিলাগণের বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিতে যখন বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তখন এক দিন দুর্গামোহন দাস মহাশয়, এবং যতদূর স্মরণ হয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়, স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণ সহ, মন্দিরের উপাসনা কালে, পুরুষ-উপাসকগণের মধ্যে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মদলের মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। উপাসকমণ্ডলীর প্রাচীন সভ্যগণ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিপদে পড়িয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিয়া একটা কিছু স্থির করিতে না করিতে দ্বিতীয় দিন স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষীয়েরা আবার সপরিবারে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে বারে মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক মহিলাগণকে সকলের মধ্যে বসিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বিবাদ না করিয়া চলিয়া গেলেন। তদবধি তাঁহারা মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন; এবং একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রথমে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রতিবাদকারিগণ গিয়া তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে উপাসনা করিবার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ধরিলেন। যে কেহ উপাসনা করিতে ডাকিত, তিনি নিতান্ত অসমর্থ না হইলে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, দেবেন্দ্রনাথের এই নিয়ম ছিল; সুতরাং তিনি আহ্বান মাত্র আসিয়া একদিন উপাসনা করিয়া নবসমাজের উৎসাহী সভ্য-

গণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। ক্রমে ঐ সমাজ একটী স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল।

কেশবচন্দ্র দেখিলেন তাঁহার সঙ্গের লোক দুই ভাগ হইয়া যায়, অনেক চিন্তা ও প্রার্থনানন্তর তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের এক পার্শ্বে স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয় পরিবার সকলের মহিলাগণের জন্য পর্দ্দার বাহিরে আসন নির্দ্দেশ করিলেন। তাহা এক কোণে ও রেলের মধ্যে হওয়াতে যদিও ঐ দলের সকলের প্রীতিপ্রদ হইল না, তথাপি দাস মহাশয়ের পরামর্শানুসারে গাঙ্গুলি ভায়ার দল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, কিছুদিন পরেই স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিলেন এবং পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাতে আসিতে লাগিলেন।

ইহার পরে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় "ভারত আশ্রম" স্থাপন করিয়া তাহাতে বয়ঃস্থা মহিলাদিগের জন্য একটী স্কুল খুলিলেন। ব্রাহ্ম-পরিবার সকলের অনেক মহিলা তাহাতে ছাত্রী হইলেন। কিন্তু ঐ বিদ্যালয় স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয়দিগের মনঃপুত হইল না। কারণ ঐ বিদ্যালয়ে কেশববাবু মহিলাদিগের শিক্ষার যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয়গণের মতে প্রকৃত আদর্শ অপেক্ষা হীন ছিল। কেশবচন্দ্র নারীদিগকে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি লজিক, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেন না। তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে ও নারীতে ভেদ রাখিতে চাহিতেন। নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত বোধ করিতেন না। অপর পক্ষ ইহার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা নারীদিগকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত উচ্চশিক্ষা দিতে চাহিতেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির উদ্যোগে এবং দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে অনুমান ১৮৭৩ সালে, কলিকাতার সন্নিহিত বালিগঞ্জ নামক স্থানে, কুমারী এক্রয়েডকে তত্ত্বাবধায়িকা করিয়া, হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নামে নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য এক বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিলেন।

দুর্গামোহন বাবু এই স্কুলে স্বীয় কন্যাদিগকে দিলেন। কেবল তাহা নহে তাঁহার পত্নী এই স্কুলের বালিকাদিগের অনেকের মাতৃস্থান অধিকার করিলেন ছুটীর দিনে তাঁহার গৃহই বালিকাদের বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান হইত। সে সময়ে তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিলেই দেখা যাইত যে ব্রহ্মময়ী স্বীয় ও অপরের কন্যাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া তাহাদের কি আনন্দ! তিনিও তাহাদের কল্যাণ চিন্তাতে নিমগ্ন। কোন্ মেয়ের ভবিষ্য

কিরূপ হইবে, কার জন্য কি করা উচিত, আমাদের সঙ্গে এই কথাই উপস্থিত করিতেন।

এদিকে এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে কতকগুলি হিন্দু বিধবা পলাইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিল। তাহারা যায় কোথায়? দুর্গামোহন দাসের ভবন তাহাদের পিতৃভবন স্বরূপ হইল। ব্রহ্মময়ীর পক্ষপুটের মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। এই বিধবাদিগের অনেকে পরে পরিণীত হইয়া সৎপাত্রগত হইয়াছে।

এইরূপ সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে অনুমান ১৮৭৫ সালে ব্রহ্মময়ী এলোক হইতে অবসৃত হইলেন। দুর্গামোহনের গৃহ শূন্য হইল।

ইহার পরে ১৮৭৮ সালে ব্রহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিবাদ ঘটনা হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হয়, তখন দাস মহাশয় ঐ সমাজ স্থাপনের উদ্যোগী পুরুষদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। তদবধি বহুকাল ইহার কার্য্যের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং পীড়িত হইয়া দেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইহার পরে তাঁহার তিন কন্যা সৎপাত্রগত হইলে এবং তাঁহার তিন পুত্র বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া আসিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যে বসিলে, তিনি নিতান্ত একাকী হইয়া পড়েন। সেই সময়ে ঢাকার কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের এক বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহেও তাঁহাকে নির্যাতন সহিতে হইয়াছিল। তাঁহার চিরাগত রীতি অনুসারে দুর্গামোহন সমুদয় নির্য্যাতন অম্লান-চিত্তে বহন করিলেন; এবং নব-পরিণীতা পত্নীর সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ সুখ অধিক কাল ভোগ করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিলেন। কিছুতেই আর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল না। অবশেষে ১৮৯৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ভবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ইহাঁর সহৃদয়তা ও মুক্তহস্ততা বন্ধুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। যে কথা সেই কাজ; যদি ইনি কখনও মুখ দিয়া কিছু দিব বলিয়া কথা বাহির করিতেন আমরা জানিতাম যে টাকা ব্যাঙ্কে আছে। দরিদ্রদিগের, বিশেষতঃ স্বীয় পরিচিত দুঃস্থ ব্যক্তিগণের, সাহায্যার্থ এরূপ মুক্তহস্ত দাতা অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ইনি সহস্র সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

বন্ধুদের প্রতি কি প্রেম! মুখে মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন না; কার্য্যে অকৃত্রিম তাহা প্রেম প্রকাশিত হইত। তিনি মুখে সর্ব্বদাই বলিতেন "ধর্ম্মের উঁচু উঁচু কথা অধিক জানি না; ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব অধিক বুঝি না; পার্কার দুই চারিটী কথা শিখাইয়া গিয়াছেন; তাহাই ধ্যানে জ্ঞানে রাখিয়াছি,—একটা কথা এই, মনে, বাক্যে, কার্য্যে খাঁটি থাকিতে হইবে; দ্বিতীয় কথা এই জীবনের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে পালন করিয়া ঈশ্বরের পূজার উপযুক্ত হইতে হইবে। "এরূপে জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ব্রহ্মময়ীকে সুখী করিবার জন্য তাহার যে ব্যগ্রতা দেখিয়াছি তাহা অতীব প্রশংসনীয়; তৎপরে নিজের অবস্থাতে পুত্র কন্যাদিগকে যত উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তাহা দিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকে কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ করিয়া মান্দ্রাজে মেডিকেল কালেজে পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই পরে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বসুর পত্নী হইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবের প্রতি কর্ত্তব্য স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য এসকল বিষয়েও তাঁহার আচরণ আদর্শ-স্থানীয় ছিল। সংক্ষেপে বলি এরূপ উদারচেতা, স্বজনবৎসল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ অল্পই দেখিয়াছি।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

এইবার আমি এক বীরপুরুষের জীবনচরিত বর্ণন করিতে যাইতেছি। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ সাহসী, দৃঢ়চেতা, অকুতোভয়, বীরপ্রকৃতির মানুষ অল্পই দেখিয়াছি। ইঁহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কুলীনের দুর্গ বিক্রমপুর হইতে এই মানুষটী আসিয়াছিলেন; এবং কিছুকাল আমাদের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। সেই কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজের ছবি আমাদের হৃদয়পটে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথ বাঙ্গালা ১২৫১ ও ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৯ই বৈশাখ দিবসে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের বংশ সুপ্রসিদ্ধ বেঘের কুলীন বংশ। এই বেঘের কুলীনগণ কুল-মর্য্যাদাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য অপরাপর কুলীনেরা ব্যস্ত।

দ্বারকানাথের পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় ধর্ম্ম উপলক্ষে সে

সময়ে ফরিদপুরে বাস করিতেন। তিনি পরদুঃখ কাতরতার জন্য বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বারকানাথ পিতার পরদুঃখকাতরতা প্রচুর মাত্রায় পাইয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় তাঁহার তেজস্বিনী, মনস্বিনী, ধর্ম্মপরায়ণ মাতাই তাঁহার চরিত্রকে প্রধানরূপে গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার দৃঢ়চিত্ততা বিষয়ে একটী জনশ্রুতি চলিত আছে। একবার তিনি তীর্থ দর্শনের মানসে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি ধনীর কন্যা ছিলেন; মনে করিলে যান বাহনাদির সাহায্যে নিজ অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারিতেন; এবং তাঁহার পিতৃকুলও সেরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের মাতার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান এমনি প্রবল ছিল যে কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। অথচ আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয়ে সেই তীর্থ যাত্রা পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। যথা সময়ে তীর্থ যাত্রা করিলেন এবং নিজের পদদ্বয়ের সাহায্যে তাহা সমাধা করিলেন। দ্বারকানাথ সেই মাতার সন্তান, তাঁহাতে উত্তরকালে আমরা যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান দেখিয়াছি, তাহা মানুষে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার আত্মমর্য্যাদাতে আঘাত লাগিলে তিনি অবমাননাকারীকে জানিতে দিতেন যে সিংহের সহিত তাঁহার কারবার। যে স্থলে এরূপে জানিতে দেওয়া সম্ভব হইত না সে স্থলে তিনি মনের আবেগে অচেতন হইয়া পড়িতেন।

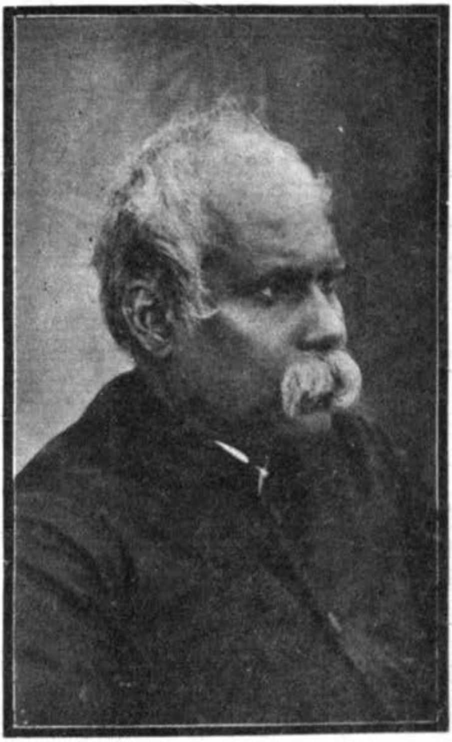
সে যাহা হউক, শৈশবে গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ইংরাজী শিখিবার বাসনা প্রবল হইল। তখন তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থান ফরিদপুরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আবার মাগুরখণ্ডে ফিরিয়া আনা হইল। এই অবস্থাতে তাঁহার অতিশয় ব্যগ্রতা বশতঃ তাঁহাকে গ্রামের নিকটবর্ত্তী কালীপাড়া গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি নানা অসুবিধার মধ্যে সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন। কিন্তু সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টাতে তাঁহাতে বিব্রত হইতে হইল। এই অবস্থাতে তিনি পর পর তিন স্থানে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন; প্রথম, বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং, দ্বিতীয় ফরিদপুরস্থ ওলপুরে, তৃতীয় লোনসিং গ্রামের মাইনর স্কুলে।

ইহার মধ্যে তাঁহার জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার বয়ঃক্রম

যখন ১৭ বৎসর তখন একদিন শুনিলেন যে এক হতভাগিনী বিপথগামিনী কুলীন কন্যাকে তাহার আত্মীয় স্বজন বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছে। এই দারুণ সংবাদ তাঁহার পরদুঃখকাতর প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন কুলীন কন্যাদিগকে এরূপে হত্যা করা বিরল ঘটনা নহে। তখন তাঁহার অন্তরাত্মা ক্রোধে দুঃখে অধীর হইয়া গেল! তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কুলীন-শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি বহু-বিবাহ রূপ গর্হিত কার্য্যে কখনও লিপ্ত হইবেন না। নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার ফল এই হইবে যে তাঁহার দুই অবিবাহিতা ভগিনীকে চিরকৌমার্য্য ধারণ করিতে হইবে; তাহা জানিয়াও তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রাখিবার সংকল্প করিলেন, এবং সে সংকল্প রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঐ কুলীন কন্যার হত্যাসংবাদ শ্রবণে কেবল যে বহুবিবাহের প্রতি তিনি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার প্রাণ ভারতীয় নারীকুলের দুঃখ দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইল। তিনি ভারতীয় নারীগণের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৯ সালে যখন তিনি লোনসিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন তখন মনের ভাব এইরূপ। সেইভাব লইয়া ঐ সালে তিনি "অবলাবান্ধব" নামে এক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিলেন। কাগজ খানি ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগণ্য সভ্য অভয়াকুমার দাস মহাশয়ের পুত্র প্রাণকুমার দাস প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী যুবক তাঁহার সহায় হইলেন। প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের কয়েক জনকে "অবলা বান্ধবে" মধ্যে মধ্যে লিখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গেলেন। আমরা "অবলাবান্ধব" পড়িয়া অবাক হইতে লাগিলাম। কোন্ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে এ কোন ব্যক্তি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এরূপ উদার মত ব্যক্ত করিতেছেন।

ক্রমে গাঙ্গুলি ভায়া তাঁর কলিকাতাবাসী প্রবন্ধলেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার জন্য একবার সহরে আসিলেন। আমরা আমাদের 'হীরোকে' দেখিয়া লইলাম! বন্ধু সমাগমে স্থির হইল যে অবলাবান্ধব কলিকাতায় তুলিয়া আনা হইবে। তদনুসারে ১৮৭০ সালে দ্বারকানাথ অবলাবান্ধব লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া তাঁহার মহা পরিশ্রম আরম্ভ হইল। কলিকাতা আসাতে



দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৩৪০ পৃষ্ঠা)

B. KAR, BEE PRESS.

তিনি ঢাকার বন্ধুগণের সাহায্য হারাইলেন; কিন্তু কলিকাতাতে হঠাৎ সেরূপ সাহায্য পাইলেন না। অবলাবান্ধব সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য তাঁহার একার স্কন্ধে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধ লেখা, প্রুফ দেখা, লেবেল লেখা, বণ্টন করা প্রভৃতি প্রায় সকল কার্য্যই একা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। আহ্লাদিতচিত্তে সমুদয় সহ্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই এক অবলাবান্ধব নারীহিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রাহ্মসমাজের অপরাপর আলোচনা ও আন্দোলনের মধ্যে নারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে অলোচনা ও আন্দোলন চলিল। যে ১৮৭১ সালে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের বিবাহোপযুক্ত বয়স স্থির করিবার জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, সেই ১৮৭১ সালেই তলে তলে ব্রাহ্মমহিলাদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন চলিল। তাহা অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। ব্রাহ্মমহিলাগণের উপাসনামন্দিরে পর্দার বাহিরে বসিবার অধিকার লইয়া এই আন্দোলন পাকিয়া উঠিল। কিরূপে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতাশ্রমে বয়স্থা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; এবং কি কারণে অবলাবান্ধব দল তাহাতে যোগ দিলেন না, তাহা অগ্রে বর্ণন করিয়াছি। ১৮৭৩ সালে গাঙ্গুলী ভায়া কুমারী একরয়েড নামক নবাগতা এক সুশিক্ষিতা ইংরাজমহিলাকে তত্বাবধায়িকা করিয়া "হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়" নামে বালিকাদিগের জন্য উচ্চশ্রেণীর এক বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার জন্য অর্থসংগ্রহ করা, যান বহনাদির বন্দোবস্ত করা, পাঠাদির ব্যবস্থা করা, ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থা করা, তাহাদের পীড়াদির সময়ে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যের ভার একা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল। তিনি আহ্লাদিতচিত্তে সেই সকল শ্রম বহন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতাম যে মানুষ এতদূর শ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য।

কুমারী একরয়েড বরিশালের জজ বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলে ১৮৭৫ সালে ঐ হিন্দু মহিলাবিদ্যালয় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় রূপে পরিণত হয়, এবং কয়েক বৎসর পরেই বেথুন কালেজের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

বঙ্গমহিলাবিদ্যালয় উঠিয়া গেল বটে কিন্তু দ্বারকানাথের কার্য্য শেষ হইল না। এদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের রাজনীতি চর্চ্চার জন্য ভারতসভা স্থাপিত হইল। এখানে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আর এক কার্য্যক্ষেত্র খুলিল।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার সহকারী সম্পাদক হইয়া অসাধারণ শ্রম করিতে লাগিলেন। মনোযোগপূর্ব্বক রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের আলোচনা করা, আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করা, সঞ্জীবনী সংবাদপত্রের সৃষ্টি ও সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করা, কংগ্রেসাদির কার্য্যের প্রধান ভার গ্রহণ করা ইত্যাদি নানা কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রকৃতিই এই ছিল যে, যে কার্য্যে হাত দিতেন তাহা প্রাণ মনের সহিত করিতেন। একবার তিনি আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য স্বয়ং আসামে গমন করিলেন। তখন বর্ষাকাল সমাগত ব্রহ্মপুত্র জলপূর্ণ হইয়া দুই ধার প্লাবিত করিতেছে; যাতায়াত দুঃসাধ্য, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কত অনুরোধ করা গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না; জলে ঝড়ে প্লাবনে স্বকার্য্য সাধনে রত রহিলেন। একদিন পথে চলিতে চলিতে নদীর স্রোতে জলমগ্ন হইলেন। সে দিন অতি কষ্টে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল। তথাপি তাঁহার উৎসাহ বা কার্য্যতৎপরতার বিরাম হইল না। সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া সর্ব্বত্রই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস; অধিকাংশ স্থলে ডেপুটী কমিশনরগণ বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাঁহার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন।

এইরূপ অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করিয়াও তিনি চা-বাগানের কুলীদের বিষয়ে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন; এবং সঞ্জীবনীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই হতভাগ্য কুলীদের দুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, তাঁহার প্রেরিত সংবাদে লোকের চিত্ত চমকিয়া উঠিল, কুলীদের রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দিন দিন কুলীসংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট কুলী আইনের সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ আইন সংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহা আছে তাহাও নির্দ্দোষ নহে। এখনও হতভাগ্য কুলীগণ না জানিয়া আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় করিয়া বন্দীদশাতে দিন যাপন করিতেছে। আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নাই, তাহাদের জন্য কাঁদিবার লোকও নাই।

একদিকে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় কার্য্য করিতেছিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যশক্তি আর

একদিকে ব্যাপৃত ছিল। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ইহার একজন প্রধান সারথি ছিলেন। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ইহার উদ্যোগকারী ব্রাহ্মগণ "সমালোচক" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। অল্পদিন পরেই তিনি তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া তাহাতে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহা নহে, সে সময়ের বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অগ্রণী হইতে লাগিলেন। বিবাদ অনেকেই করিয়াছিল, কিন্তু অপরের বিবাদে আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাদে একটু প্রভেদ ছিল। অন্যে বিবাদ করে, এবং বিবাদের পশ্চাতে বিদ্বেষ রাখে; গাঙ্গুলি ভায়ার বিবাদে তীব্রতা থাকিত, কটূক্তি থাকিত, উচিত কথা বলা থাকিত, শুনিলে মনে হইত শকুনি যেমন মৃত প্রাণীর পেট পা দিয়া চাপিয়া ভিতরকার নাড়িভুঁড়ি বাহির করে, তেমনি যেন তিনি বিপক্ষের পেট চাপিয়া ঠোঁট দিয়া নাড়িভুড়ি বাহির করিতে পারেন, কিন্তু ফলতঃ বিদ্বেষবুদ্ধি তাঁহার মনের ত্রিসীমায় থাকিত না। তিনি বলিবার যাহা বলিলেন, প্রতিবাদীর মুখের উপরেই বলিলেন; করিবার যাহা করিলেন, দশজনের সমক্ষেই করিলেন; তৎপরেই আর কিছুই নাই, বিদ্বেষ লইয়া ঘরে আসিলেন না। এই গুণের জন্যই আমরা তাঁহাকে ভালবাসিতাম। তাঁহার কথা বা ব্যবহারে ক্লেশ পান নাই, এমন অল্প লোকই আমাদের মধ্যে আছেন; কিন্তু এসকল সত্বেও তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন না, এমন কাহাকেও দেখি নাই। তিনি তৎপরে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন।

অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে তাঁহার নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধীয় কার্য্য শেষ হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রথম পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পরে বহুদিন তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। অবশেষে তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠা উচ্চশিক্ষিতা কাদম্বিনী বসুর পাণিগ্রহণ করেন। কুমারী কাদম্বিনী ১৮৮৩ সালে বি, এ, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পরে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া, তাঁহাকে মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়া তোলেন। প্রথমতঃ তাঁহারি প্ররোচনাতে কাদম্বিনী মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করেন; এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা সমাধা করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন; এবং সেখান হইতে উপাধিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

কেবল রাজনীতির চর্চ্চা এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারেই যে গাঙ্গুলি মহাশয়ের

সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা নহে, এত কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্যে তিনি সাহিত্য-রচনার সময় পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত কোন কোনও গ্রন্থ বিশেষ সমাদর পাইয়াছে। "বীরনারী" ও "সুরুচির কুটীর" নামে তিনি দুইখানি উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন "জীবনালেখ্য" নামে এক গ্রন্থে স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর জীবন চরিত ব্যক্ত করেন; এবং বহু পরিশ্রম সহকারে ইংরাজী "ইয়ারবুক" নামক গ্রন্থের অনুকরণে "নববার্ষিকী" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বঙ্গের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন চরিত তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার শিশুপাঠ্য কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। এইরূপ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৮ সালের ১৩ই আষাঢ় দিবসে গুরুতর যকৃৎরোগে তিনি গতায়ু হন।

মনোমোহন ঘোষ।

১৮৭০ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে যে সকল সাধু পুরুষের শক্তি বঙ্গসমাজে বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষ একজন। কৃতী বারিষ্টার, ও পদে সম্ভ্রমে অগ্রগণ্য বলিয়াই যে তাঁহাকে আমরা জানিয়াছিলাম তাহা নহে; স্বদেশ-হিতৈষী, সদাশয়, ও সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি ১৮৭৬ সালে যখন ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহার ভবন ঐ সভার প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিগণের সম্মিলনের স্থান ছিল। কেবল তাহা নহে; ঐ কালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা বিধানার্থ যে কিছু আয়োজন হইয়াছিল, তিনি সে সকলের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে নব্যবঙ্গের এই তৃতীয় যুগের একজন নেতা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

মনোমোহন ১৮৪৪ সালের ১৩ই মার্চ্চ দিবসে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামলোচন ঘোষ সে কালের একজন সবজজ ও স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, রামলোচন যৌবনকালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া, প্রীতি ও শ্রদ্ধাসূত্রে উক্ত মহাপুরুষের সহিত বদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার নিকট হইতে হৃদয় মনের উদার ভাব

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোমোহন উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতার উদার ভাব লাভ করিয়াছিলেন।

মনোমোহন বাল্যকালে নদীয়া জেলাস্থ কৃষ্ণনগর সহরে স্বীয় পিতার নিকট থাকিয়া কৃষ্ণনগর কালেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ১৮৫৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। তৎপূর্ব্বেই ১৮৫৮ সালে টাকী শ্রীপুরের বিখ্যাত রায়বংশের অন্যতম বংশধর শ্যামাচরণ রায়ের কন্যা স্বর্ণলতার সহিত তিনি পরিণয়-পাশে বদ্ধ হন। এই শ্রীপুরের রায়গণ সুপ্রসিদ্ধ বসন্ত রায়ের বংশজাত। কুলমর্য্যাদাতে ইঁহারা বঙ্গদেশের কায়স্থ-সমাজে অগ্রগণ্য। রামলোচন নিজে পদ-গৌরবে অগ্রগণ্য হইয়া এই সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-পরিবারের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

অগ্রেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে সময়ে নীলের হাঙ্গামা ও আন্দোলনে সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিশেষভাবে নদীয়া জেলা অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল। নীলকর-দিগের অত্যাচার ও প্রজাদের ধর্ম্মঘট উভয় চলিতেছিল। ঐ নীলের হাঙ্গামা বালক মনোমোহনের চিত্তকে উত্তেজিত করে। কৃষ্ণনগরে থাকিতে থাকিতে ১৮৬০ সালে, তিনি নীলকরদিগের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিপজ্জালে জড়িত হইয়া অসময়ে প্রাণত্যাগ করাতে তাহা নাকি উক্ত পত্রিকাতে যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; এবং তাহাই নাকি মনোমোহনকে "ইণ্ডিয়ান মিরার" প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছিল।

১৮৬১ সালে মনোমোহন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে পাঠ করিতে আসিলেন; এবং এখানে আসিয়া নবোদীয়মান কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন। ইঁহারা দুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। তাহা এক্ষণে দৈনিক হইয়াছে; এবং কেশববাবুর পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে।

১৮৬২ সালে ঘোষজ মহাশয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন; এবং সেখানে চারি বৎসর বাস করেন। ইহার মধ্যে তিনি দুইবার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষাতে উপস্থিত হন; কিন্তু পরীক্ষার নিয়মাদির পরিবর্ত্তন ঘটাতে দুইবারই অকৃতকার্য্য হন। তৎপরে বারিষ্টারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ সালের জুন মাসে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। এই সময়ে

তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভ হইতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে বারিষ্টারি কার্য্য আরম্ভ করেন।

বারিষ্টারি আরম্ভ করিবামাত্র তাঁহার প্রতিভা উক্ত কোর্টের জজদিগের এবং দেশের লোকের নয়নগোচর হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন; এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা বিষয়ে একজন সুবিজ্ঞ বারিষ্টার হইয়া উঠিলেন। তিনি হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি ফিয়ার সাহেব প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের প্রিয়পাত্র হইলেন।

কিন্তু যেজন্য তিনি বঙ্গদেশের উপকারী বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন, তাহা তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিতা। তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধান বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এবিষয়ে তাঁহার মনোযোগ অবিশ্রান্ত ছিল। তিনি মরণের দিন পর্য্যন্ত বেথুন কালেজের সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রথমে আপনার পত্নীর শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তখন স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার স্থান ছিল না। তিনি শিক্ষা-বিধানার্থ আপনার পত্নীকে লোরেটোকন্‌ভেণ্ট নামক সন্ন্যাসিনীদিগের আশ্রমে রাখিলেন। এই সময়ে তাঁহার যে সংযম, মিতাচার ও স্বকর্ত্তব্য-সাধনে দৃঢ়মতি দেখা গিয়াছিল, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে ঘোষজ মহাশয়ের এই সময়কার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি।

পত্নীকে শিক্ষিতা করিয়া লইয়া তিনি সংসার পাতিয়া বসিলেন; এবং বিবিধ প্রকারে স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তন্মধ্যে একটা কাজ তিনি করিতে লাগিলেন যেজন্য স্বদেশের লোকের অনুরাগভাজন হইলেন। যে সকল স্থলে তিনি দেখিতেন যে কোনও লোক রাজকর্ম্মচারীদের অবিচারে বা অত্যাচারে ক্লেশ পাইতেছে, সে সকল স্থলে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের আইনজ্ঞতার দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। এজন্য তিনি গুরুতর শ্রম করিতে কাতর হইতেন না। ঐ সকল মোকদ্দমা এরূপ দক্ষতার সহিত চালাইতেন যে অধিকাংশ স্থলেই জয়লাভ করিতেন; এবং দেশে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া যাইত। এইরূপে তাঁহার পরিচালিত অনেক মোকদ্দমা আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৮৭২ সালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা লইয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে যখন

আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন তিনি উচ্চশিক্ষা পক্ষপাতিগণের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা কুমারী এক্রয়েড এদেশে আসিয়া তাঁহারই ভবন আশ্রয় করিলেন; এবং সেখানে বসিয়া এদেশীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধানের বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে।

১৮৭৬ সালে ভারতসভা যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন; তাঁহার ভবন ইহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের সম্মিলনের ক্ষেত্র হইল; এবং তিনি ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে ইহার কর্ম্মচারীদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপিত হইলে তিনি উৎসাহের সহিত রাজনীতির আন্দোলনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের অবলম্বিত আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে একটী বিষয় তিনি সর্ব্বপ্রথমে অবতারণা করেন; এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন। তাহা বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করা। রাজপুরুষগণ এতদিনের পর এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু মনোমোহন ঘোষ মহাশয় যে সময়ে এদিকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন এবিষয়ে অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই। ইহাতেই তাঁহার দূরদর্শিতা ও স্বজাতিপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

১৮৬৯ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনি স্বদেশবাসিগণের চিত্তে স্বজাতি প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নানা স্থানে বক্তৃতাদি করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি স্বদেশীয়গণের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করিয়া সে দেশের নানা স্থানে ভারতের দুঃখ দুর্গতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার ফলে অনেকের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হয়; এবং ইংলণ্ডে ভারতহিতৈষী দলের অঙ্গপুষ্টি ও তাঁহাদের প্রভাব বৃদ্ধি হয়।

এইরূপে স্বদেশের হিত চিন্তাতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৬ সালে দারুণ পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতৃভক্তি অতিশয় প্রগাঢ় ছিল। কলিকাতায় বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময়েও একটু অবসর পাইলেই জননীর চরণদর্শনের জন্য কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে যাইতেন; এবং মাতৃ সঙ্গে কয়েক দিন যাপন করিয়া আসিতেন। সেই নিয়মানুসারে ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে পূজার বন্ধের সময় কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একদিন হঠাৎ মাথাতে রক্ত উঠিয়া অচেতন হইয়া

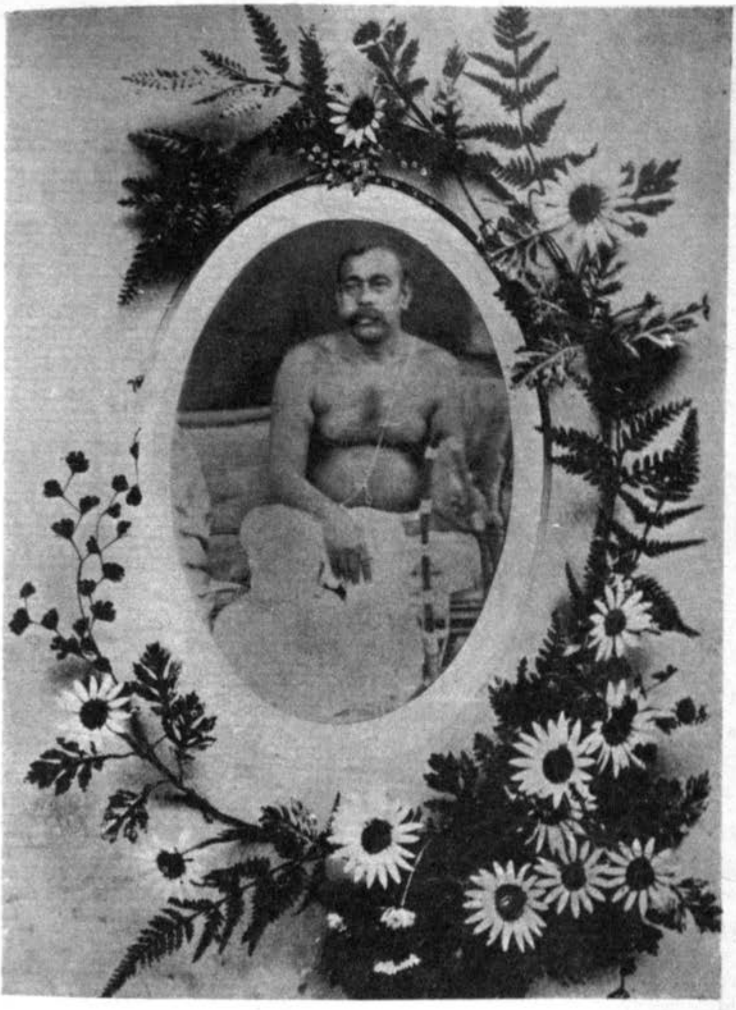
পড়েন। তাহার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ বায়ু তাঁহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন; সেজন্য তাঁহাদের জীবন-চরিত ব্যক্ত করা গেল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কৃষ্ণনগরে বসিবার পর ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা লীলাবতীর বিবাহ হয়। ডাক্তার তারিণীচরণ ভাদুড়ী নামক একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনের সহিত এই বিবাহ হয়। দেশীয় প্রচলিত রীতি-অনুসারে এ বিবাহ হয় নাই। লাহিড়া মহাশয় নিজে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন; এবং লীলাবতী তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই বিবাহ মহাসমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্র প্রভৃতি কৃষ্ণনগরের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবাহ-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা হইতে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের লোকে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি ভালবাসিত যে কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি, এই গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে ও সাহায্য করিতে কেহই ত্রুটী করেন নাই। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ রায় পরিবারের ভ্রাতৃগণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রায় বাহাদুর যদুনাথ রায়, কুমারনাথ রায়, কৃষ্ণনাথ রায়, ও দেবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সদাশয়তার জন্য কৃষ্ণনগরে সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের আতিথ্য ও সৌজন্য যাঁহারা একবার ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা বিস্মৃত হইবেন না। যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন, সেইখানেই সাহায্য করা যখন এই পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের স্বভাব, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যার বিবাহে যে ইঁহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি। লাহিড়ী মহাশয়কে ইঁহারা চিরদিন পরমাত্মীয় ও অভিভাবক-স্বরূপ ভাবিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং লীলাবতীর বিবাহকে ইঁহারা আপনা-



স্বর্গীয় যদুনাথ রায়বাহাদুর।

(৩৫০ পৃষ্ঠা)

Kar, Bee Press.

দের নিজের গৃহের কন্যার বিবাহ জ্ঞান করিয়া কয় ভাই বুক দিয়া পড়িয়াছিলেন। আহারাদির উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সমুচিত অভ্যর্থনা করা, প্রভৃতি সকল কার্য্যের ভার ইঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনও দিকে কিছুরই অপ্রতুল হয় নাই।

লাহিড়ী মহাশয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানের কথা বলিতে গেলেই দুইটী কথা স্মরণ হয়; এবং প্রকৃত সাধুতার কি অপূর্ব্ব আকর্ষণ তাহা মনে হইয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। প্রথম, কৃষ্ণনগরের আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকের তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়াছি, তাহা কোনও দিন ভুলিবার নহে। একটি ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। আমি একবার কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলাম; তখন লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরে ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাইতেছি, পথে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর মানুষ দেখিলাম। তখন সায়ংকাল; বোধ হইল তাহারা বাজার করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে। আমি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। হঠাৎ আমার মনে হইল, রামতনু বাবুর প্রতি ইহাদের কিরূপ ভাব একবার দেখি। এই ভাবিয়া পশ্চাৎ হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁহে বাপু, তোমরা কি কৃষ্ণনগরের লোক?"

উত্তর। আজ্ঞে, কৃষ্ণনগরেরই বল্‌তে হবে, পাশের গ্রামের।

প্রশ্ন। তোমরা কি রামতনু লাহিড়ীকে জান?

উত্তর। কে? আমাদের বুড়ো লাহিড়ী বাবু? তাঁকে কে না জানে?

প্রশ্ন। তিনি কেমন মানুষ?

উত্তর। তিনি কি মানুষ? তিনি দেবতা।

প্রশ্ন। সে কি হে! পৈতে ফেলা লোক, হাঁস মুরগী খান, দেবতা কেমন?

অমনি মানুষগুলি ফিরিয়া দাঁড়াইল। "কে গা মশাই, আপনি বোধ হয় এদেশের মানুষ নন।"

"না বাপু, আমি এদেশের মানুষ নই।"

উত্তর। ওঃ তাইতে, আপনি যে সব বল্‌লেন ও সব করা অন্যের পক্ষে দোষ, ওঁর পক্ষে দোষ নয়, উনি যা করেন তাই শোভা পায়।

আমি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। পরে কতলোকের নিকট এই গল্প করিয়াছি।

বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি কৃষ্ণনগরের সাধারণ লোকের যখন এই ভাব ছিল, তখন ভদ্রলোকদের কি ভাব ছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহার কন্যার বিবাহে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপরে দ্বিতীয় স্মরণ রাখিবার যোগ্য কথা, লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্রগণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি। ইহা স্মরণ করিলেও মন মুগ্ধ হয়। তিনি পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া বসিলে এই গুরুভক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহা বলিতে কিছুই লজ্জা বোধ করিতেছি না, বরং আনন্দিত হইতেছি, তাঁহার পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এই সময় হইতে ঠিক পুত্রের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতনামা স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয় সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি নিজ গুরুর জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ পরে করিব। অপরাপর অনুগত ছাত্রের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন। ইঁহারা এখনও লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবার পরিজনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন; এবং সর্ব্ববিধ অবস্থায় উপদেশ, পরামর্শ, সাহায্যাদি দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্য করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীগণ্য। ইনি পৃষ্ঠপোষক না হইলে শরৎকুমার নিজ ব্যবসাতে যে পরিমাণে উন্নতি করিয়াছেন তাহা করিতে পারিতেন না। বালী উত্তরপাড়া স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের যে স্মৃতিফলক রহিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ইঁহার গুরুভক্তির নিদর্শন। ধন্য গুরু! যাঁহাকে একবার দেখিয়া জীবনে ভোলা যায় না। ধন্য ছাত্র! যাঁহারা আমরণ গুরুকে হৃদয়ের উচ্চতম স্থানে রাখিয়া পূজা করিতে পারেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময়ে যাহা দাঁড়াইতেছে তাহা স্মরণ করিয়া এই ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সুখ হয়। এই সকল ছাত্রের কথা ভাবিলেও আনন্দ হয়।

লাহিড়ী মহাশয়কে ও তাঁহার পরিবার পরিজনকে ইহারা যে ভাবে পরিচর্য্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্র না হইয়াও বন্ধুতা ও প্রীতিসূত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন যে তাঁহার কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহায্য দানে মুক্ত-হস্ত ছিলেন।

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে লীলাবতী পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। অন্নপ্রাশনের সময় এই পুত্রের নাম চারুচন্দ্র রাখা হয়। সে সময়েও কৃষ্ণনগরের



রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস্, আই।

(৩৫২ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

সে সময়ে কিছুদিনের জন্য লাহিড়ী মহাশয় গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধনী পরিবার, মুখুয্যে বাবুদের, বাড়ীতে নাবালক পুত্রগণের অভিভাবকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের খ্যাতি দেশমধ্যে এরূপ ব্যাপ্ত ছিল, যে অভিভাবক কাহাকে করা যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে গবর্ণমেণ্টের পরামর্শক্রমে তাঁহাকেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি তদুপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেই খানেই আপনার স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং গোবরডাঙ্গাতেও যে নিজের স্মৃতি রাখিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহার প্রমাণ স্বরূপ খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৃষ্ণনগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রামতনু লাহিড়ী, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃক গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাঁহার গোবরডাঙ্গায় অবস্থিতি কালে তিনি সর্ব্বদা খাঁটুরা-দত্তবাটীর ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত সর্ব্ব-বিষয়ে যোগদান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। একজন বিজ্ঞ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোক, চিরপ্রচলিত জাতি, কুসংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া, যুবক ব্রাহ্মের সহিত সকল বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহা পল্লীগ্রামের মধ্যে একটী সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। তাঁহার এরূপ কার্য্য দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইত; কিন্তু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নিন্দা-সূচক কোন কথা কেহ ব্যক্ত করিত না। যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, তাঁহার আহ্বানে এমন ব্যক্তিও সে সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কারাপন্ন যে সকল হিন্দুদিগের ব্রাহ্মদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি সেই সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া উদারভাবে মিশিয়া তাঁহাদিগের সদ্ভাব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিতে এই প্রকারে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।"

১৮৬৯ সালে কলিকাতা সহরে লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, পরলোকগত দ্বারকানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, অন্নদায়িনীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন হয়। অগ্রেই বলিয়াছি দ্বারকানাথ লাহিড়ী উত্তরকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহার গৃহিণী বা কন্যাগণকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি এলোক হইতে অবসৃত হন। পিতার মৃত্যুর

পর তাঁহার দুই কন্যা অন্নদায়িনী ও রাধারাণী কলিকাতাতে আনীত হন; এবং লাহিড়ী মহাশয়ের অভিভাবকতার অধীনে রক্ষিতা হন। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় কন্যাকর্ত্তা হইয়া, এই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কলিকাতা নিবাসী সুপরিচিত ব্রাহ্ম হরগোপাল সরকারের সহিত অন্নদায়িনীর বিবাহ হয়। এই সময় হইতে ব্রাহ্মদিগের সহিত ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬৯ সাল হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতাতে আসিতেন; এবং প্রায় তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রীদিগের গৃহে বাস করিতেন। সেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত তাঁহার আলাপ ও আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময়ে আমিও তাঁহার সহিত পরিচিত হই। আমার বেশ স্মরণ আছে, যখন তিনি নব ব্রাহ্মদলকে দেখিলেন, তখন আনন্দিত হইয়া সর্ব্বদা বলিতেন, "হায়! রসিককৃষ্ণ ও রামগোপাল যদি এখন থাকিতেন, তাহা হইলে একবার এই যুবকদিগকে লইয়া দেখাইয়া বলিতাম, "দেখ তোমরা দেশে যেরূপ অগ্রসর দল দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেরূপ দল দেখা দিয়াছে"।

এই সময়ের কয়েক দিনের কয়েকটী ঘটনা আমার স্মৃতিতে আছে। প্রথম, অন্নদায়িনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র যখন বাহির হয়, তখন তিনি আমাদিগকে তাঁহার বন্ধুবান্ধবের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিলেন, এবং আমরা তাঁহাদের অনেকের নাম জানিতাম, সুতরাং আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করিলাম। পাঠ করিয়া তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ করিয়া দিলেন। কিন্তু কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ পদস্থ লোকের নাম আমাদের কৃত তালিকা হইতে কাটিয়া দিলেন। আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলাম। কারণ উক্ত ভদ্রলোকটীর সহিত যে তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা আছে, তাহা আমরা জানিতাম। এমন কি প্রায় প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন; এবং সেখানে চা প্রভৃতি খাইতেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের তালিকা হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেওয়াতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমাদিগকে কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। এই মাত্র বলিলেন—"তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই, আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ করবো না।" পরে পরম্পরাতে জানিতে পারিলাম, সেই ভদ্রলোকটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া ব্রহ্মোপাসনা-কালে পার্শ্বের ঘরে বসিয়া তামাক

খাইয়াছিলেন এবং হাসিয়াছিলেন বলিয়া বর্জ্জিত হইলেন। লাহিড়ী মহাশয় আমাদিগকে বর্জ্জনের কারণ কোনও ক্রমেই বলিলেন না; কিন্তু শুনিলাম সেই ভদ্রলোককে তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি না কি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি এমনি হাল্‌কা লোক যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বন্ধুভাবে ডাকিয়াছে, এবং তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র কাজ যাহাকে মনে করে তাহা করিতেছে, তুমি সে সময় টুকুর জন্যও গাম্ভীর্য্য রাখিতে পারিলে না! আমার ভাইঝীর বিবাহে ঈশ্বরের নাম হইবে আমি তোমাকে কিরূপে ডাকি?"

বাস্তবিক "ঈশ্বরের নাম বৃথা লইও না"—এই উপদেশ তিনি এমনি পালন করিতেন, যে যেমন তেমন অবস্থাতে ঈশ্বরের নাম শুনিতে চাহিতেন না। একবার একজন বন্ধু একজন সুগায়ককে তাঁহার সহিত পরিচিত করিবার জন্য আনিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চা খাইতেছিলেন। নবাগত ব্যক্তিটী উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংগীত করিতে পারেন শুনিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন "আমাকে একটী গান শোনাতে হবে।" যেই এই কথা বলা, অমনি গায়ক মহাশয় গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"মহাশয়! একটু বিলম্ব করুন, আমি যে ভগবানের নাম শুনিবার অবস্থাতে নাই।" এই বলিয়া চার সরঞ্জামগুলি সরাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। তৎপরে চাদরখানি পাড়িয়া গলে দিয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন,—"এখন গান করুন"। ঈশ্বরের নামে সে ভক্তি, সে হৃদয়ের আগ্রহ কি আর দেখিব! একদিনের কথা আর ভুলিব না। সেদিন প্রত্যূষে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সকলকে লইয়া একটু ভগবানের নাম করিতে হইবে। তাহাই করা গেল। আমরা চক্ষু খুলিয়া দেখি, তিনি কখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; গলবস্ত্র হইয়া চাদরখানি দুই হস্তের মধ্যে ধরিয়া আছেন; আর খেজুর গাছের নলি দিয়া যেরূপ রস পড়ে, তেমনি সেই শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সমুদয় মুখখানি প্রেমের আভাতে উজ্জ্বল। আমার যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাদ ভেদ করিয়া উপরকার কোনও লোক হইতে কোনও উন্নত জগতের একটী জীবকে নামাইয়া দিয়াছে। আমি অনিমেষ—নয়নে সেই প্রেমোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যেদিন সে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা চিরদিন স্মৃতিতে থাকিবে। এমন মানুষ কি ঈশ্বরোপাসনার সময় তালঘু দেখিলে মার্জ্জনা করিতে পারেন?

বন্ধুকে বর্জ্জনের কারণ যে আমাদের নিকট কোনও প্রকারেই বলিলেন না, তাহার মধ্যেও একটু কথা আছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার যাহা কিছু বলিবার থাকিত, তাহা সহজে সে ব্যক্তির অসাক্ষাতে অপরকে বলিতেন না। তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে বলিতেন, তাহাতে ফলাফল কিছুই গণনা করিতেন না। এজন্য তাঁহার পরিচিত আত্মীয়-দিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্যায় করিলে তাঁহাকে অতিশয় ডরাইতেন। কারণ, তিনি বলিবার সময় কিছুই মনের ভাব গোপন করিতেন না।

আর এক দিনের কথা স্মরণ আছে। একদিন প্রাতে লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘরে ফিরিবার সময়ে পথে তিনি বলিলেন—"একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকার দিনটা সার্থক করবে?" আমি বলিলাম—"এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে?" তখন তিনি আমাকে একজন খ্রীষ্টীয় পাদরীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া যে ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ও তাঁহার প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ফলতঃ লাহিড়ী মহাশয় যেখানেই অকৃত্রিম সাধুতা দেখিতেন সেইখানেই অকপটে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতেন। তাঁহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান বিচার ছিল না। অনেক দিন এরূপ হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণনগর হইতে সহরে আসিয়াছেন, শুনিয়া আমরা তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলাম, গিয়া দেখি তিনি বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ী দুই দিন রহিয়াছেন, অথবা কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে আছেন, অথবা কোনও খ্রীষ্টীয় বন্ধুর অতিথি হইয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বসম্প্রদায়ের, মধ্যে তাঁহার বন্ধু ছিল; সকল শ্রেণীর লোককেই তিনি ভালবাসিতেন। এই তাঁহার চরিত্রের আর একটী গুণ, যাহা দেখিয়া আমরা বড়ই মুগ্ধ হইতাম।

১২৭৭ বঙ্গাব্দ (১৮৭০) ৩রা আষাঢ় দিবসে কৃষ্ণনগরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র বিনয়কুমারের জন্ম হয়। তৎপূর্ব্বে ১৮৬৬ সালে আর একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়া অল্প বয়সেই ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে গতাসু হয়।

১৮৭২ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন লাহিড়ী মহাশয় স্ত্রী-স্বাধীনতাপক্ষীয়দিগের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি Sir J. B. Phear ও তাঁহার গৃহিণীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও

আত্মীয়তা জন্মে। স্ত্রী-স্বাধীনতাদলের অগ্রণী হইয়া একবার তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে লইয়া টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন; এবং তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে বসাইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাচীন বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহাকে তামাসা করিয়া বলিলেন—"কি হে রামতনু! বুড়ো বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশ্‌লে নাকি?" লাহিড়ী মহাশয় টাউনহল হইতে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"প্যারীর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওরা হালকা লোক, আমি মেয়েদের ত্রিসীমায় আস্‌তে দিলাম না।" ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্যগ্রসর হইয়াও আদব কায়দার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন।

তৎপরে স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয়গণ "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" নামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তিনি আপনার দ্বিতীয়া কন্যা ইন্দুমতীকে সেই স্কুলে দিলেন। নারী জাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। নারীগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের যে পরিবারের অতিথিরূপে বাস করিতেন, সে পরিবারের মহিলাগণের আনন্দের সীমা থাকিত না। কারণ, তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রামের পর, দুপর বেলা পরিবারস্থ নারীগণকে এক ঘরে একত্র করিতন; নানা প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া মুখে মুখে তাঁহাদিগকে অনেক ভাল ভাল বিষয় শুনাইতেন। কখনও বা নারীগণের মধ্যে কাহাকেও কোনও একটা বিষয় পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। একজন পড়িতেন আর সকলে শুনিতেন; তিনি মধ্যে মধ্যে পঠিত বিষয় অবলম্বন করিয়া মুখে মুখে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের গোচর করিতেন। এইরূপে তিনি দশদিন কোনও গৃহে থাকিলে সেখানকার হাওয়া আর এক প্রকার করিয়া তুলিতেন। কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মন এক উচ্চভূমিতে আরোহণ করিত।

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন "ভারতাশ্রম" নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় অপরাপর পরিবার-গণের সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লাহিড়ী মহা-শয় মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার যৌবন-সুহৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্র; সুতরাং তাঁহার প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ছিল। কেবল স্নেহ নহে, ঈশ্বর-ভক্ত মানুষ

বলিয়া তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি কেশববাবু উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার কোনও একটী কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন, স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না; "ওঃ কেশব কি বল্লেন, ওঃ কেশব কি বল্লেন" বলিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। বলিতে কি তাঁহার নিজের ভক্তিভাব এতই অধিক ছিল, যে অতিরিক্ত মনের আবেগ হইত বলিয়া তিনি আমাদের উপাসনাতে অনেক সময় বসিতেই পারিতেন না।

এই ত কেশব বাবুর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয়দিগের হইয়া তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইতে ক্রটী করিতেন না। এই সকল কথা শুনিতে এক এক সময় এত রূক্ষ বোধ হইত যে অপরের অসহ্য হইয়া উঠিত। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। আশ্রমবাস-কালের একদিনের ঘটনা মনে আছে। একদিন রামতনু বাবু তাঁহার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, কাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগের অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পীড়িত যৌবন-সুহৃদের নাম করিবামাত্র একজন মহিলা বলিয়া উঠিলেন—"ওমা ওমা, এমন মানুষকেও আপনি দেখ্‌তে যান? সে যে লক্ষীছাড়া লোক।" শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। কেন যে ঐ মহিলা ওরূপ বলিলেন তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার সেই যৌবন-সুহৃদটী যৌবন-কালে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেই সময় তিনি যেখানেই যাইতেন সেইখানেই তাঁহার স্খলিত-চরিত্র লোক বলিয়া অখ্যাতি হইত। ঐ মহিলাটী সেরূপ কোনও কোনও স্থানে থাকিয়া ঐরূপ অখ্যাতি অনেক দিন শুনিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর তাঁহার স্বভাব-চরিত্র শুধরাইয়া গিয়াছে; তিনি ধর্ম্মচিন্তাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন; তখন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত ও মৃত্যুশয্যাতে শয়ান; এ সকল সংবাদ ঐ মহিলা জানিতেন না। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—"ঠাক্‌রুন! আপনি কেন তাকে লক্ষীছাড়া লোক বল্লেন, তা আমি জানি। কিন্তু তার সে সব অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে; সে এখন বড় ভাল লোক হয়েছে; কেবল ধর্ম্মের কথা নিয়েই আছে; বিশেষ সে মৃত্যুশয্যাতে পড়েছে,

আমার কি যাওয়া উচিত নয়?" এই বলিয়া ঐ ব্যক্তির সহৃদয়তা, ধর্ম্মভীরুতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন-স্বরূপ এক একটী গল্প করিতে লাগিলেন। একটী গল্প শেষ হয়, আর ঐ মহিলাটীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলেন—"ঠাকরুন্ ঠিক করে বলুন এতটা আপনি কর্‌তে পার্‌তেন কি না?" অমনি ঐ মহিলাটী বিনীতবদনে বলেন—"না এতটা বোধ হয় আমা দ্বারা হতো না।" এই-রূপে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া শেষে বলিলেন—"দেখুন ঠাকরুন! আমরা মানুষের মন্দটাই দেখি, ভালটা দেখি না। মন্দ মানুষেরও ভালটা দেখ্‌তে হয়। ঈশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন, তাহলে কি আমরা পার পাই?"

এই সময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার সুখেই যাইতেছিল। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে পাইয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহা-দের অনেক কার্য্যে যোগ দিতেছিলেন। কেবল তাহাও নয়; স্বর্গীয় খ্যাতনামা ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের ভ্রাতা বারাসতবাসী সুপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেন। তিনি শেষ দশায় এক প্রকার চলৎশক্তি—রহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক সাধুতা ও বিদ্যাবত্তার গুণে তাঁহার ভবন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একটা প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্যামাচরণ দে, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি নবরত্নের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭০ সাল হইতে মধ্যে মধ্যে সহরে আসিয়া সেই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেন; এবং সকলের পূজা লাভ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্নের এক প্রধান রত্ন ছিলেন। তিনি বহুকাল বারাসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপরে কলিকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া শেষে প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রোফেসারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে কালেজের ছেলেদের জন্য বর্ত্তমান ইডেন হষ্টেলের অনুরূপ একটী আবাস-বাটিক স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি চোরবাগানে একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন; এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূপে তিনি সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহ-দাতা ছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপান নিবারণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এতদর্থে ১৮৬৩ সালে একটী সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে

ইংরাজীতে Well-Wisher ও বাঙ্গালাতে "হিতসাধক" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির হইত; তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইত। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই কার্য্যের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। বলিতে কি তিনিই আমাদিগকে সুরাপানের বিরোধী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেশের হিতচিন্তা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহাকে লাহিড়ী মহাশয় বড় ভাল বাসিতেন। ইঁহাদের সহবাসে তিনি বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সুখ তাঁহার অধিক দিন থাকিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমার এই সময়ে সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা মেডিকেল কালেজে পড়িতেছিলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন হঠাৎ সে আশাতে নিরাশ হইতে হইল।

এই সময়ে নবকুমারের যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি স্বীয় পাঠ্য বিষয়ে কৃতী হইবার জন্য গুরুতর শ্রম করিতেন! সে শ্রম সহ হইল না! পূর্ব্বোক্ত উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইল। লাহিড়ী মহাশয় সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়া আসিলেন; কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া নবকুমারের বাসাতে গেলেন; এবং মেডিকেল কালেজের তদানীন্তন প্রিন্সি-পাল ডাক্তার নর্ম্মান চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১৮৫২।৫৩ সালে বালীতে অবস্থান কালে ডাক্তার চিভার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। সেই আত্মীয়তাসূত্রে ডাক্তার চিভার্স এই সময়ে তাঁহাকে বিধিমতে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবকুমারকে কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসাতে লওয়া হইল। সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা, শুশ্রূষা, যত্নের দ্বারা যাহা হইতে পারে সকলি হইতে লাগিল।

কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম দেখা গেল না। অবশেষে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। নবকুমার কৃষ্ণনগরে গেলেন, সেই সঙ্গে ইন্দুমতীকেও তাঁহার শুশ্রূষার জন্য যাইতে হইল। তিনি হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয়ে অতি উৎসাসের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন এবং সর্ব্বজনের প্রিয় হইয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের দারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। রোগীর সেবা করা ইন্দুমতীর যেন জন্মগত সিদ্ধবিদ্যা ছিল। যে ইন্দু অপরে পীড়িত হইলে দাসীর মত তাহার সেবা করিতেন, সেই

ইন্দু কি আপনার জ্যেষ্ঠের পীড়ার কথা শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? মনে হইল বৃদ্ধা জননীর প্রতি সংসারের সকল কাজের ভার, দাদার সেবা করে কে? তাই পড়াশুনা ছাড়িয়া, ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার বন্ধ করিয়া, দুরন্ত পরিশ্রম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কৃষ্ণনগরে গেলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিয়া বিশেষ উপকার না হওয়াতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নবকুমারকে ভাগলপুরে লইয়া যাওয়া হইল। ইন্দুমতী শুশ্রূষার ভার লইয়া সঙ্গে গেলেন।

নবকুমার পীড়িত হওয়া অবধি পরিবার মধ্যে রোগের পর রোগ দেখা দিয়া সমগ্র পরিবারটীকে যেন উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল! লাহিড়ী মহাশয়ের নিজের শরীর ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বদা অসুস্থ থাকিত। এক দিন অন্তর তাঁহার জ্বরভাব হইত। সেই খারাপ দিনে তিনি নড়িতে চাহিতেন না; শয্যায় থাকিতেন। তখন যে ভবনে থাকিতেন সেখানকার মহিলাদিগের কিছু কাজ বাড়িত। দিনের বেলা অধিকাংশ সময় একজন না একজনকে নিকটে বসিয়া কিছু না কিছু ভাল বিষয় পড়িয়া শুনাইতে হইত। কলিকাতাতে যখন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা, ইন্দুমতী সঙ্গে থাকিলে ইন্দুমতী, ঐ কাজ করিতেন। এক দিনের ঘটনা বলিতেছি। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি শয়ান আছেন; ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্নদায়িনীকে "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেবারকার "ধর্ম্মতত্ত্বে" কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গত-সভার আলোচনার বিবরণ ছিল। সেবারে সঙ্গতে রিপুদমন বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার মধ্যে কেশববাবু বলিয়াছিলেন, যে "রিপুগুলোর মধ্যে যেন পারিবারিক সম্বন্ধ আছে। একটার ঘাড় ভাঙ্গিলে অন্যগুলোর ভয় হয় বুঝি বা আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে; তারা ভয়ে কম-জোর হইয়া পড়ে"। কেশববাবুর এই উক্তিগুলি ধর্ম্মতত্ত্বে সঙ্গতের আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে তাঁর নাম ছিল না। অন্নদায়িনী যেই কথাগুলি পড়িয়াছেন, অমনি লাহিড়ী মহাশয় "ও কি কথা, এমন কথা কে বল্লে?" বলিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। জ্বরভাব আর মনে থাকিল না! খারাপ দিন কোথায় পলায়ন করিল! সেই ভাবে একেবারে বিভোর! বাড়ীর মহিলাদিগকে ডাকাইয়া সকলকে সেই কথাগুলি শুনাইলেন। বলিলেন "ঠিক কথা! ঠিক কথা! একটা প্রবৃত্তিকে যে দমন করে তার পক্ষে অন্যগুলো দমন করা সহজ হয়। এমন কথা কে বল্লে, এ কেশব না হয়ে যায় না।"

মহিলারা ত আর সঙ্গতে যান না, তাঁরা এ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না। তখন আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগের সহিত এক বাড়ীতে থাকিতাম। যেই আমি বৈকালে বাড়ীতে পা দিয়াছি, অমনি বলিলেন "ডাক ডাক শিবনাথকে ডাক, শুনি এমন কথা কে বল্‌লে।" আমার বস্ত্র পরিবর্ত্তনের বিলম্ব সহিল না। আমি গিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন—"যা পড়ে শুনাও ত।" উক্তিগুলি পুনরায় পঠিত হইলে আমি বলিলাম—"ও কথা কেশববাবু বলেছেন।" অমনি আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না,—"দেখেছ আমি বলেছি কেশব না হয়ে যায় না, সে বিনা এমন কথা কে বল্‌তে পারে।" সে দিন জ্বরের কথা ভুলিয়া গেলেন; আর শয়ন করিলেন না; আমাদের সঙ্গে রিপুদমন ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিল।

সে সময়ে যে কেবল লাহিড়ী মহাশয়েরই শরীর অসুস্থ থাকিত তাহা নহে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার, তাঁহার চতুর্থ পুত্র বিনয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতীর একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র, ইহাদের কাহারও না কাহারও অসুস্থতার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত।

প্রথমে ভাগলপুরে গিয়া নবকুমারের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম দেখা গিয়াছিল। এমন কি তিনি অল্পে অল্পে চিকিৎসা ব্যবসাও আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শরৎকুমারের শরীর অসুস্থ হওয়াতে তাহাকেও আপনার কাছে লইয়া দুই ভাই বোনে তাহার শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে পিতা মাতা অবশিষ্ট পরিবার লইয়া কৃষ্ণনগরে ছিলেন। দিন এক প্রকার সুখেই চলিতেছিল। এমন সময়ে ঐ সালের নবেম্বর মাসে দেশে এক নিদারুণ সংবাদ আসিল। লাহিড়ী মহাশয় তারে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার জামাতা তারিণীচরণ ভাদুড়ী হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাশীপুর নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্সেরির ডাক্তার ছিলেন। কেন যে হঠাৎ আত্মহত্যা করিলেন তাহার কারণ জানিতে পারা গেল না। এই ঘটনাতে লাহিড়ী মহাশয়ের ছিন্ন ভিন্ন পরিবার যেন আরও ভগ্ন হইয়া গেল। লীলাবতী পুত্রটি লইয়া এখন হইতে সম্পূর্ণরূপে পিতার উপরেই পড়িলেন। সেই শোকার্ত্তা কন্যার মুখ দর্শন করিয়া তাঁহার কোমল ও প্রেমিক হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এদিকে এই দারুণ সংবাদ ভাগলপুরে পৌছিলে, নবকুমার ও ইন্দুমতী



স্বর্গীয়া ইন্দুমতী দেবী।

(৩৬৩ পৃষ্ঠা

B. Kar, Bee Press.

বৃদ্ধ পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা আসিয়া সকলকে ভাগলপুরে লইয়া গেলেন। কিন্তু ভাঙ্গা কাচ যেমন আর যোড়া লাগে না, তেমনি যেন ইঁহাদের ভগ্ন পারিবারিক সুখ আর যোড়া লাগিল না। কিছু দিন পরে পরিবার পরিজন বোধ হয় আবার কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন। নবকুমার ও ইন্দুমতী ভাগলপুরেই রহিলেন। ইহার পরেই নবকুমারের পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার যক্ষ্মা ভীষণ আকার ধারণ করিল। এই সময়ে ইন্দুমতী কিরূপে ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী ভাইবোনের দৃষ্টান্তের জন্য লিখিয়া রাখিবার মত কথা। পরসেবা যে ইন্দুমতীর স্বাভাবিক ব্রত ছিল, পরের সেবা করিতে পাইলে যার আনন্দের সীমা থাকিত না, তার পক্ষে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরের শুশ্রূষা যে কি হৃদয়ানন্দকর কার্য্য ছিল, তাহা আর কি বলিব। ইন্দুমতী একেবারে দেহ মন প্রাণ সেই কার্য্যে নিক্ষেপ করিলেন। আমি ভাগলপুরের লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে অনেক দিন ইন্দুমতীর স্নানার্দ্র বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গিয়াছে। নিজে রন্ধনাদি করিয়া ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া, বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইয়া, স্নান করিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ভ্রাতার কাশীর শব্দ ও কাতরধ্বনি শুনিলেন; চাকর ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, বাবু ডাকিতেছেন।" অমনি দৌড়িয়া গেলেন, ঔষধ খাওয়াইতে ও বাতাস করিতে করিতে অঙ্গের বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গেল। অনেক দিন এমন হইয়াছে, যে রন্ধন করিয়া বেলা দশটার সময় ভ্রাতাকে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়াছেন, কোনও একটা জিনিস বা কাজ মনের মত না হওয়াতে নবকুমার অন্ন ব্যঞ্জন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে ভগিনীর বিরক্তি বা দ্বিরুক্তি নাই, কেবল সেই বিশাল নয়নদ্বয় দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। বলিতে লাগিলেন—"দাদা! তোমার যে খেতে দেরী হয়ে অসুখ বাড়্বে।" আবার নূতন অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজের খাওয়া দাওয়া মনে রহিল না। অনেক রাত্রি অনিদ্রা অবস্থায় ইন্দুমতীর চক্ষের উপর দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল। রাত্রে অনিদ্রা দিনে দুরন্ত শ্রম! আমরা সকলেই ইন্দুমতীকে ভালবাসিতাম, যখন তাঁহার এই তপস্যার কথা শুনিলাম, তখন তাঁহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল; কিন্তু এত শ্রম সহিবে না ভাবিয়া সকলেই ভীত হইতে লাগিলাম।

যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। এরূপ ভ্রাতার সেবা আর অধিক

দিন চলিল না। অচিরকালের মধ্যে ইন্দুমতী দারুণ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন ধর, ধর, থেকা থেকা পড়িয়া গেল। পায়ে ও মস্তকে দুই স্থানে এক সঙ্গে কৃষ্ণসর্পে দংশন করিলে যেমন হয় লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারের দশা যেন তেমনি হইল? নবকুমারের পীড়া বরং রহিয়া বসিয়া বাড়িতেছিল; চোকে কাণে দেখিবার শুনিবার অবসর দিতেছিল; কিন্তু ইন্দুমতীর যক্ষ্মা মণ্ডুকপ্লুতিতে বাড়িতে লাগিল। ১৮৭৭ সালের মধ্যভাগে পীড়া এতই বাড়িয়া উঠিল, যে ঐ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহাকে ভাগলপুর হইতে আরাতে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীলা ব্যতীত অপর সকলে আরাতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আরাতে গিয়া নবকুমার বা ইন্দুমতীর পীড়ার কোনও প্রকার উপশম না হউক, আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা মৃদুমতী, আড়াই বৎসরের বালিকা, সেখানে বিষম জ্বর-রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে এক মাসের মধ্যেই ইন্দুমতীর জীবনের আশা চলিয়া গেল; চিকিৎসকগণ জবাব দিলেন। এই সঙ্কটাবস্থায় পরম বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে, ইন্দুমতীর অবসান কাল কৃষ্ণনগরে যাপন করিবার উদ্দেশে, লাহিড়ী মহাশয় পরিবার পরিজনকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন ইন্দুর এমন অবস্থা যে তাঁহাকে হুগলীতে নামাইয়া নৌকাযোগে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইতে হইল।

কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়া ইন্দুমতী শেষ শয্যা, মৃত্যু-শয্যা, পাতিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের পত্নীর কথা আর কি লিখিব। হে পাঠক! যদি মানুষের হৃদয় থাকে তবে একবার ধারণা করিবার চেষ্টা কর, সেই ভগ্ন-হৃদয়া মাতা কি ভাবে সংসারের কাজ ও পীড়িত সন্তানদের সেবা চালাইতে লাগিলেন। সাধে কি নারী জাতীকে এত শ্রদ্ধা করি, ইন্দুমতী মরিতে মরিতেও কেবল জ্যেষ্ঠ সহোদরের চিন্তাই করিতেন। পিতা বা মাতা নিকটে আসিয়া বসিলে, সুস্থির হইয়া বসিতে দিতেন না; বলিতেন, "তোমরা দাদাকে দেখ, তোমরা দাদাকে দেখ, আমার কাছে বস্‌বার দরকার নেই; আমার কাছে দিদীরা আছেন।" এইরূপ প্রায় প্রতিদিন তুলিয়া দিতেন। ওদিকে নবকুমার বুঝিলেন ভগিনীর আসন্নকাল উপস্থিত; এবং ইন্দু তাঁহার জন্যই মরিতেছে; সুতরাং তিনি নিজের অসুখ ভুলিয়া গিয়া ভগিনীর শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বার বার উঠিয়া ভগিনীকে দেখা, সময়ে ঔষধ পড়িতেছে



পত্নী, গঙ্গামণি দেবী।

(৩৬৫ পৃষ্ঠা

B. Kar, Bee Press.

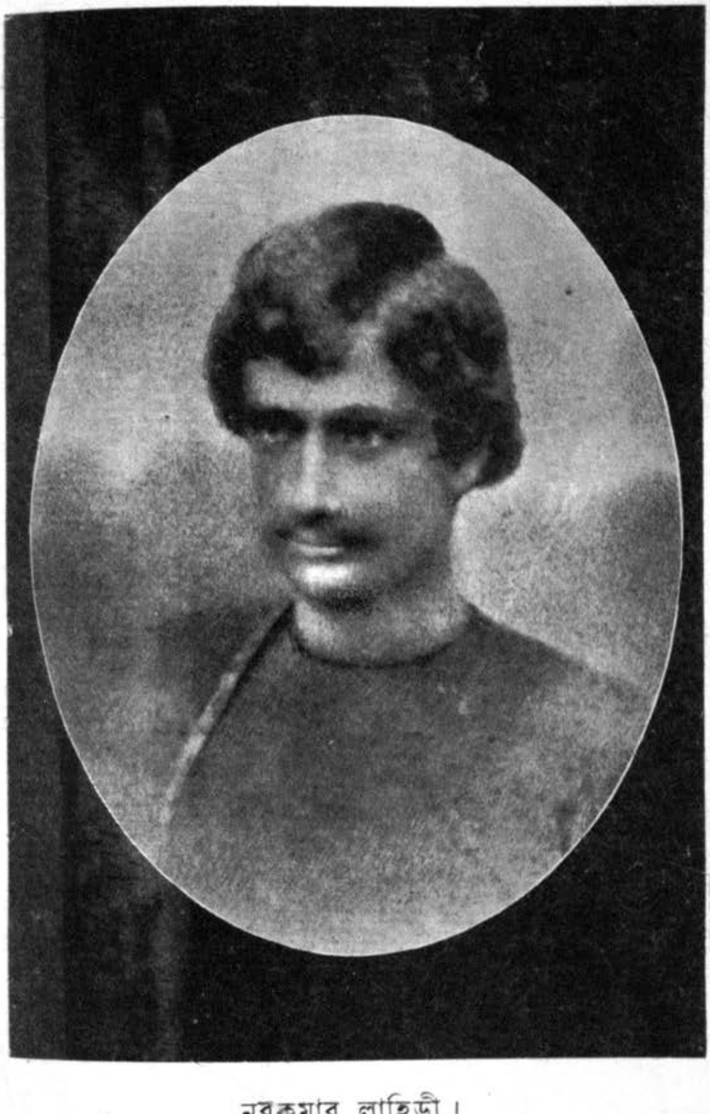
কি না, যখন যাহা আবশ্যক তাহা হইতেছে কি না, এই সকল সংবাদ লওয়া, নিরন্তর এই কাজ চলিল। ইন্দুর রোগের উপশম কিসে হয় সে বিষয়ে অবিশ্রান্ত মনোযোগ দিতে লাগিলেন। যেন তাঁহার শক্তি থাকিলে মৃত্যুর মুখ হইতে ভগিনীকে ছিঁড়িয়া আনেন। কিন্তু হায় কে কবে মৃত্যুর মুখ হইতে মানুষকে ছিঁড়িয়া আনিয়াছে! ইন্দুর জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ত্বরায় ক্ষীণ প্রভা ধারণ করিল! অবশেষে ১৮৭৭ সালের ৭ঠা ডিসেম্বরের বিষম দিন উপস্থিত হইল। ঐ দিনে মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইন্দুমতী পিতাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিলেন "দিদি! বাবাকে একবার ডাক।" তখনি রামতনু বাবুকে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন ইন্দু ছট্ ফট্ করিতেছেন; ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দু! কেন আমাকে ডেকেছ?" ইন্দুমতী চক্ষু খুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা! আজ আমার কাছে বসো; আজ আমাকে বড় অস্থির করচে।" লাহিড়ী মহাশয় নিকটে বসিয়া কন্যার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, "ইন্দু! আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আর কিছু করবার নেই, এখন ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা কর যে তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতনা হ'তে উদ্ধার করুন।" ইন্দু বক্ষঃস্থলে দুইহাত তুলিয়া বলিলেন—"ঈশ্বর আমাকে ত্বরায় উদ্ধার কর।" তৎপরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অনুমতি চাহিলেন, "বাবা আমি যাই"? লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন "যাও"; অমনি ইন্দুমতী বক্ষের উপরে দুই হাত বাঁধিয়া স্থির ভাব ধরিলেন; সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণবায়ু ক্ষীণ দেহযষ্টি ছাড়িয়া গেল।

এই পারিবারিক বিপদে মানুষ দেখিতে পাইল রামতনু লাহিড়ীর মধ্যে কি জিনিস ছিল। ওরূপ সোণার চাঁদ মেয়ে চক্ষের সমক্ষে মিলাইয়া গেল, তাহাতে একটী ওঃ আঃ করা, বা শোকাশ্রু বর্ষণ করা কিছুই করিলেন না। প্রত্যুত যখন তাঁহার গৃহিণী "মারে ইন্দুরে!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তখন দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার মুখ আবরণ করিলেন,—"কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে অনেক যন্ত্রণা হইতে তিনি তাকে শান্তিধামে নিয়েছেন। এখন অধীর হ'ও না; আর একটী সন্তান এখনো শ্বসছে; তার প্রতি কর্ত্তব্য এখনও বাকি আছে, এখন অধীর হ'লে তার সেবার ব্যাঘাত হবে; সে যদি আর দু মাস বাঁচতো আর দশদিন বাঁচবে না; চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই।"

বাস্তবিক! এই বিশ্বাসী সাধুপুরুষ শোক জয় করিয়াছিলেন। আমি একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে ইন্দুমতীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে ইন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপাসনা হইল। উপাসনার মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ "ইন্দু" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন; পরে দেখা গেল যে বস্ত্রাঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। উপাসনা ভাঙ্গিলে উক্ত বন্ধুটীকে বলিলেন—"দেখ আমরা হাজার ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলি না কেন কাজে তাঁকে মঙ্গলময় বলিয়া ধরা কত কঠিন! আমি আজ ইন্দুর জন্য কেঁদে অবিশ্বাস প্রকাশ করলাম; এটা কি সত্য নয়, আমার ইন্দু এখন তাঁর মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কাঁদি কেন?" বলিয়া এই ক্ষণিক শোক প্রকাশের জন্য বহু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরেই ধীর স্থির, স্বকর্ত্তব্যসাধনে তৎপর।

এদিকে ইন্দুমতী চলিয়া গেলে নবকুমার প্রাণে এমনি আঘাত পাইলেন যে তাঁর জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। সেই যে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাঁহাকে ভাল করিয়া হাসিতে দেখে নাই। ইন্দু তাঁহার জন্য কি করিয়াছে, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই আনুপূর্ব্বিক ভাবিতে লাগিলেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার মেজাজ খারাপ হইয়া ইন্দুকে কি ক্লেশ দিয়াছেন তাহা বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত তিনি বালিশে মুখ গুঁজিয়া আছেন, চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে। একবার তাঁহার শয্যার পার্শ্বে একখণ্ড কাগজ কুড়াইয়া পাওয়া গেল, তাহাতে দেখা গেল সেই রুগ্ন, দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হস্তে যেন কি লিখিতেছিলেন—অধিক লিখিতে পারেন নাই। O! darling Sister! বলিয়া আরম্ভ করিয়া সামান্য দুই এক ছত্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাটার জলের ন্যায় তাঁহারও জীবনের শক্তি তিল তিল করিয়া ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সহস্র চেষ্টা ও শুশ্রূষাতে কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে ১৮৭৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সেই দিন উপস্থিত হইল, যে দিন নবকুমারকেও হারাইতে হইল।

সে দিনকার অবস্থাও চিরস্মরণীয়। সেদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা মানুষে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না। নবকুমারের প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তৎপার্শ্বে শোকার্ত্ত মাতা অচেতন হইয়া রহিয়াছেন; এদিকে রামতনু



নবকুমার লাহিড়ী।

(৩৬৬ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

বাবু পল্লীবাসী তাঁহার আত্মীয় সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের একটী পুত্রকে ধরিয়া বাহিরে প্রাঙ্গণস্থিত একটী বেঞ্চের উপরে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। সে যুবকটী নবকুমারকে এতই ভালবাসিত যে সে শোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছে; কোনও ক্রমেই শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। রামতনু বাবু তাহাকে বলিতেছেন "সে কি হে! তুমি শিক্ষিত লোক, সকল বোঝ. কোথায় তোমার জেঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত করবে, না তুমিই অধীর হয়ে গেল?" এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া উপস্থিত। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা সপ্তাহে একদিন আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। ঐজন্য তাঁহাদের একটী সঙ্গত সভার মত ছিল। সেই দিন উক্ত সভার অধিবেশনের দিন। তদনুসারে তাঁহারা উপস্থিত। তাঁহারা জানিতেন না, যে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা না জানিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লাহিড়ী মহাশয় দ্রুতপদে গিয়া বলিলেন "দেখ, আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন হবে না; আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।" সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন "অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ ঐ ঘরে পড়ে আছে, তোমরা যেওনা দেখ্‌লে কষ্ট হবে।" শুনে ত সকলে অবাক। শোকের চিহ্নমাত্রও নাই।

বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধুপুরুষ শোকজয় করিয়াছিলেন। ইন্দুমতীর মৃত্যু হইলে আমি শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি ইন্দুমতীকে অতিশয় ভালবাসিতাম। ইন্দু অনেক সময় কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন; এবং আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমার স্মরণ আছে লাহিড়ী মহাশয়কে পত্র লিখিবার সময়, আমার পত্রখানি নেত্রজলে অনেক স্থলে সিক্ত হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল, আমাকে সেই সেই শব্দ আবার পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট হইতে যখন উত্তর আসিল, তখন আমি অবাক। দুই ছত্রে পত্র শেষ হইয়াছে, এবং সে দুই ছত্র এই মর্ম্মে—"প্রিয় শিবনাথ! আমাদের শোকে যে তুমি এতদূর শোকার্ত্ত হইয়াছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি; কিন্তু এস আমরা সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে তিনি আমার কন্যাকে রোগযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

একজন বন্ধু ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছেন, যে আরা হইতে ইন্দুমতীকে কৃষ্ণনগরে লওয়ার পর তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের পত্রে সর্ব্বদা ইন্দুর সংবাদ পাইতেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই মর্ম্মে লিখিলেন—"তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, ইন্দুমতীর রোগ যন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ সুখে আছে।" পত্র পড়িয়া তাঁহার মনে হইল, সৌভাগ্যক্রমে কোনও অতর্কিত উপায়ে বোধ হয়, ইন্দুমতীর রোগের উপশম হইয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে ঐ সংবাদ ইন্দুর মৃত্যু-সংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুষকে বিগত-শোক হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; এই ত সেই উপদেশ জীবনে ফলিত দেখিয়াছি! বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যিনি মনের আবেগ বশতঃ ব্রহ্মোপাসনাস্থলে ভাল করিয়া বসিতে পারিতেন না, যিনি কাহারও সামান্য ক্লেশ দেখিলে এত উত্তেজিত হইতেন, নিজের শোকের সময় তাঁহার এই ধীরতা! প্রকৃত বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষে অসম্ভব সম্ভব হয়!

বলিতে কি, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে কেহ শোকে অতিরিক্ত কাতর হইয়া কাঁদিলে তাঁহার সহ্য হইত না। সে ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের কথা শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এ বিষয়ে একদিনকার একটী ঘটনা আমার স্মরণ আছে। নবকুমারের ও ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া চাঁপাতলাতে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া কিছু কাল ছিলেন। সেই সময় একদিন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন—"আমাদের পাশের বাড়ীতে একটী ছেলে মারা গিয়াছে, বাড়ীর লোক, পুরুষ স্ত্রী লোক, মিলিয়া কয়দিন কাঁদিতেছে। দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস না থাকলে মানুষের কি দশা হয়! আমি ওঁদের বাড়ীর পুরুষদিগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে বল্লাম, আপনারা ত পরকাল মানেন, একজন মঙ্গলকর্ত্তা আছেন তাও ত মানেন, তবে এতদিন ধরে এত কান্না কাটি কেন করেন? তাতে তাঁরা পুনর্জন্ম ও শাস্ত্রের কথা তুলেন; আমি বললাম আমি মূর্খ মানুষ, শাস্ত্র টাস্ত্র জানি না; এই বলে পালিয়ে এসেছি, তুমি শাস্ত্র জান, তুমি কি শাস্ত্রের বচন টচন তুলে ওঁদিগকে বুঝিয়ে দিতে পার, অতিরিক্ত শোক করা ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে উচিত নয়?" আমি বলিলাম,—"ওঁরা যখন তর্ক তুলেছেন তখন বুঝাতে যাওয়া বৃথা।" বুঝাইতে আর যাওয়া হইল না। আমি এই সাধু-পুরুষের ভাব দেখিয়া মনে মনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঘরে আসিলাম।

নবকুমার ও ইন্দু চলিয়া গেলে জননীর নিকট কৃষ্ণনগরের বাড়ী শ্মশান-সমান হইল। তিনি কৃষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হইলেন। যেন জীবনের সকল স্বাদ আহ্লাদ কে হরণ করিয়া লইল! কোথায় গেলে ইন্দু নবকুমারের সন্ধান পান, যেন মন সেইজন্য ব্যগ্র হইতে লাগিল। আর তাঁহাকে কৃষ্ণ-নগরে রাখা ভার হইল। ওদিকে কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ আবার বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, যে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৮২ সাল হইতে কৃষ্ণনগরের যুবরাজের যে অভিভাবকতা করিতে ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১৮৮২ সালে সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

১৮৭৯ সালে লাহিড়ী মহাশয় শোকে ভগ্ন ও রোগে জীর্ণ পরিবার পরি-জনকে লইয়া যখন কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদের অবস্থা বর্ণনাতীত। গৃহে অগ্নি লাগিলে মানুষ যেমন সে গৃহ হইতে ছুটিয়া পলায়, কোথায় দাঁড়াইবে তাহা জানে না, তেমনি তাঁহারা যেন কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়া আসিলেন, কোথায় দাঁড়াইবেন তাহা জানেন না। লাহিড়ী মহাশয়ের পেনশনের সামান্য ৭৫টী টাকা মাত্র তখনকার ভরসা; তাহাতে আর কত চলে! তৎপরে এত বৎসর ধরিয়া বিপদের উপরে বিপদ যাইতেছে, একটা ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আর একটা আসিতেছে, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে তখন তাঁহাদের কি অবস্থা। কিন্তু চরিত্রের সম্পদ যাঁহার আছে তাঁহার অন্য সম্পদ আপনি আসে। জননী ক্রোড়স্থিত শিশুকে বরং পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু জগত-জননী চরণাশ্রিত দীন ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই সাধু পুরুষের জীবনে তাহার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শান্ত ক্লান্ত দেহ মন লইয়া সহরে আসিলেন বটে, কিন্তু এখানে তাঁহাকে অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধা দানে তৃপ্ত করিবার জন্য অনেক হৃদয় প্রস্তুত ছিল। তন্মধ্যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য, তাঁহার পুত্রাধিক, স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ্য-যোগ্য। বলিতে সুখ হইতেছে, লিখিতে হৃদয় শ্রদ্ধাভরে নত হইতেছে,

ইনি আপনার গুরুকে পিতৃসম জ্ঞানে যাহা করিয়াছেন, সন্তানে তাহার অপেক্ষা অধিক করিতে পারে না। বহুকাল হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ব্ববিধ সাহায্যের জন্য ইঁহার হস্ত উন্মুক্ত হইয়াছিল। নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইয়া ইনি মাসে মাসে তাঁহার যাহা প্রয়োজন হইত জ্যেষ্ঠের ন্যায় যোগাইতেন; অনেক বিপদে লাহিড়ী মহাশয়কে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সেই শোকার্ত্ত পরিবার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীচরণ বাবু স্বীয় ব্যয়ে বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে ইঁহাদিগকে স্থাপন করিলেন; এবং সর্ব্ববিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থে এত লোকের জীবন চরিত দিয়াছি ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত না দিয়া নিরস্ত থাকি কিরূপে? বলিতে কি এমন নীরব সাধুতা, এরূপ ধর্ম্মভীরুতা ও এরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই সকল মানুষ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের গৌরব! শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাম যে দেশে সম্মানার্হ হইয়াছে তাহা এইরূপ মানুষদিগকে দেখাইতে পারা যায় বলিয়া।

কালীচরণ ঘোষ।

১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। দুই বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়; এবং ৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। ইঁহার পিতা, গদাধর ঘোষ, গোবর-ডাঙ্গার জমিদার বাবুদের সরকারে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহাদের চারি সহোদরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইঁহার পিতৃব্য শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের উপরে পড়ে। ৮ বৎসর বয়সের সময় হইতে দ্বিতীয় সহোদর অম্বিকাচরণ ঘোষের সহিত ইনি বিদ্যা শিক্ষার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। অম্বিকাচরণ অল্পকালের মধ্যে কৃষ্ণনগর কালেজের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়া উঠেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সুবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তের সহাধ্যায়ী ও সমকক্ষ ছিলেন। এই দুই জনে এমনি প্রীতি ছিল যে, কৃষ্ণনগরে জনশ্রুতি আছে যে, যে দারুণ বসন্ত রোগে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয়, সেই রোগের মধ্যে যুবক উমেশচন্দ্রের অভিভাবকগণ যাহাতে তিনি পীড়িত বন্ধুর নিকটে না যান সেই জন্য তাঁহাকে ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু উমেশচন্দ্র ঘরের চাল ফুঁড়িয়া পলাইয়া গিয়া অম্বিকাচরণের সেবা করেন। এই ঘটনা তখনকার এডুকেশন কাউনশিলের সভাপতি বীটন (বেথুন) সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি ইহার উল্লেখ করিয়া উমেশচন্দ্রকে প্রকাশ্য সভাতে প্রশংসা করেন।



কালীচরণ ঘোষ।

(৩৭০ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

১৮৫০ সালে ২০ বৎসর বয়সে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর পর কালীচরণ কৃষ্ণনগর কালেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে সেখান হইতে সিনিয়র বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে আসেন। ১৮৬০ সালে বি, এল, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ওকালতী কাজ তাঁহার ভাল লাগিল না; তাই সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৮৬১ সালে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে পদোন্নতি হইয়া নানাস্থানে বাস করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতার উপনগরে আলিপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। সম্মানের সহিত এখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নড়াইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ প্রেরিত হন। সে কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ সালে আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ১৮৮২ সালে কলিকাতার হ্যারিসন রোড ও খিদিরপুরের ডকের জমি কিনিবার ভার তাঁহার উপরে পড়ে। এ কার্য্য তিনি দক্ষতা সহকারে নিষ্পন্ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা-ভাজন হন। বিষয় কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া ১৮৯২ সালের এপ্রেল মাসে তিনি পেনশন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; এবং কলিকাতাতে বাস করিতে থাকেন। পেনশন লওয়ার পর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। ১৮৯৪ সালের ৩রা মে দিবসে কলিকাতার বাটীতে হৃদ্রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামাখানা ত এই গেল। কিন্তু তিনি কি মানুষ ছিলেন তাহা সংক্ষেপে বলিবার নহে। তাহা দেখিয়া আমরা সর্ব্বদাই বলিতাম উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। পঠদ্দশাতেই বারাসতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের কন্যা কুন্তীবালার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহের ঘটক ছিলেন; তিনিই কৃষ্ণনগরে গিয়া পাত্র দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুন্তীবালার অল্পবয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। তখন নবীনকৃষ্ণের ভ্রাতা, বঙ্গসমাজে জ্ঞান ও সাধুতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ, কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের প্রতি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে। কালীকৃষ্ণ বাবু নিজে যত্নপূর্ব্বক কুন্তীবালাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! সুখের সমুদয় উপকরণ যখন বিদ্যমান, তখন এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া ১৮৬৯ সাল হইতে চিরজীবনের জন্য কালীচরণ বাবুর পারিবারিক সুখ বিনষ্ট হয়। ঐ সালে অকালে এক পুত্র হারাইয়া কুন্তী উন্মাদ-রোগগ্রস্তা হন। তদবধি কালীচরণ বাবুর গৃহ শান্তিহীন হইয়া যায়। উন্মাদ-রোগগ্রস্তা পত্নীকে

লইয়া প্রাণভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস করিতে হইত। তখন হইতে তাঁহার যে ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে।

আর একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখিবার যোগ্য। তাহা বিস্তাসাগর মহাশয়ের সহৃদয়তা। একদা কুন্তী তাঁহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গোঁ ধরিলেন যে বিস্তাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবেন না। অন্তে আহার করাইতে গেলে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অন্নের গ্রাস লইতেন না। এই সংবাদ যখন বিস্তাসাগর মহাশয়ের নিকটে গেল, তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তা আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেয়ে মারা যাবে, আমি দুবেলা গিয়া খাওয়াইয়া আসিব।" তিনি সত্য সত্যই কয়েক মাস ধরিয়া দুবেলা আসিয়া কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন! আমরা ইহা দেখিয়াছি। ইহা মিত্র পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ সুযোগ্য জামাতা কালীচরণের প্রতি, বিস্তাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক মাত্র।

পত্নীর উন্মাদরোগ-প্রাপ্তির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কালীচরণ বাবু কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, কেহ তাঁহাকে বিলাসের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে দেখে নাই। কেবল জ্ঞান-চর্চ্চা, সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবেই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

একদিকে কালীচরণ বাবু অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, দুই জনেই এই সময়ে ভগ্ন লাহিড়ী পরিবারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইঁহারা কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতনু বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারকে ডাকিয়া মেট্রপলিটান কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাগিল। পুত্রের সাহায্যে কলিকাতাতে ইঁহাদের দিন একপ্রকার চলিতে লাগিল।

আর এক সাধু পুরুষের নাম এই খানেই উল্লেখ করা উচিত। ইনি সে সময়কার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইঁহার নাম শ্যামাচরণ (দে) বিশ্বাস। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সম্মুখেই ইহার ভবন; সুতরাং প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী



স্বর্গীয় বিমলা চরণ বিশ্বাস।



স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বিশ্বাস।

B. Kar. Bee Press.

প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাঁর ভবনে সর্ব্বদা গমন করিতেন। সেখানে প্রায় প্রতিদিন এই সকল মহাজনের একটা সুহৃদ্‌গোষ্ঠীর অধিষ্ঠান হইত। শ্যামাচরণ বাবু নিজে সাধু, সদাশয়, সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী ও অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন; এজন্য তাঁহাকে সকলেই ভাল বাসিত। এমন কি আমরা তখন কালেজের ছেলে, আমরাও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। তিনি কিরূপে স্বীয় ভ্রাতা বিমলাচরণ বিশ্বাসের গুরুতর ঋণভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া, নিজের উচ্চ বেতন ও পদ সত্ত্বেও, চিরদিন টানাটানির মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ন্যায় যুবকগণের আদর্শ স্থলে ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর সহিত গভীর প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময় যখনি তিনি কলিকাতায় আসিতেন তখন আর কোথাও থাকুন না থাকুন, বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে দুই চারিদিন বাস করিতেন। অন্যত্র থাকিলেও প্রতিদিন একবার সে ভবনে পদার্পণ করিতেন। সে ভবন তাঁর নিজের ভবনের ন্যায় ছিল। সে কেবল শ্যাম বাবুর সহৃদয়তার গুণে। যে সহৃদয়তা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়কে সেবা করিয়া আসিয়াছিল, সেই সহৃদয়তা তাঁর কলিকাতায় আসার পরে যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। লাহিড়ী মহাশয় সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাঁহাদের বন্ধুতা লাভ করিয়া আপ্যায়িত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ বিশ্বাস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

আর একজন বঙ্গসমাজের রত্নস্বরূপ ব্যক্তির সদাশয়তা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে বঙ্গবাসীর সুপরিচিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সময় নাই, অসময় নাই, এই পরিবারের, বিশেষতঃ লাহিড়ী মহাশয়ের, কোনও অসুখের কথা শুনিবামাত্র নিজ শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা গণনা না করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত এই অকৃত্রিম প্রীতি ও সদ্ভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

লাহিড়ী মহাশয়কে কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া কালীচরণ বাবু কয়েক বৎসরের জন্য নড়াইলের জমিদার পরিবারের ম্যানেজার হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। শরৎকুমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু ত্বরায় তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহাকে বৃদ্ধ পিতার চিন্তাভার লঘু করিবার উদ্দেশে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিজ কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই

পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং নিজের শ্রম, মিতব্যয়িতা ও সততার গুণে সবিশেষ উন্নতি করিয়া তুলিলেন; তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিলেন সে সময় গুরুতর আভ্যন্তরীণ বিবাদে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সামান্য উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইলে, অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের মে মাসে ঐ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ ও নব নব কার্য্যের উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় কোনও দলের মানুষ ছিলেন না। চিরদিন তিনি দলাদলির বাহিরে থাকিয়া যেখানেই অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়াছেন সেই খানেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহাকে অসত্য বা অন্যায় মনে করিতেন তাহার প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিগত উদারভাবে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার ভাব ব্যক্ত করিতে ক্রটী করিতেন না। তাঁহার তৎকালীন দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন, যে একদিন তিনি "ভারতা-শ্রমে" বেড়াইতে গিয়া, কেশব বাবুর গৃহিণীর সমক্ষেই উক্ত বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়া, হয়ত কেশব বাবুর পত্নীকে ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন।

লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিয়া যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের নব আন্দোলনের মধ্যে পড়িলেন, তাহা নহে। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় তাঁহার কলিকাতা আসিবার সমকালেই পঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কর্ণেল অল্‌কট ও মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি আসিয়া বোম্বাই সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থিওসফিকাল সোসাইটী স্থাপন করেন। প্রাচীন হিন্দুভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা উক্ত উভয় সভার লক্ষ্য হওয়াতে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বিষয়ে দেশের সর্ব্বত্রই আলোচনা উপস্থিত হয়। এই আলোচনার তরঙ্গ ক্রমে আসিয়া বঙ্গদেশকে অধিকার করে। এখানে কোনও কারণে

হিন্দুসংবাদ-পত্র "বঙ্গবাসী" ও ব্রাহ্মসংবাদ-পত্র "সঞ্জীবনী" এই উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটনা হইয়া বঙ্গবাসীর পরিচালকদিগের প্রযত্নে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন উঠে। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই উদ্যোগ ও প্রয়াসে, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি কয়েকজন সনাতনধর্ম্ম-প্রচারক কলিকাতাতে পদার্পণ করেন; এবং নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের উত্তরে ব্রাহ্মসমাজের দিক হইতেও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে মহা বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধ ক্রমে মফস্বলেরও নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের স্রোত এখনও চলিয়াছে; এবং দেশের লোকের মনে স্বদেশীভাবকে জাগ্রত করিয়াছে। ইহার পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া সনাতনধর্ম্মের পুনরুত্থানের ভাবকে আরও প্রবল করিয়াছেন।

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাবে ধীর স্থির থাকিয়া কলিকাতাতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার একজন অনুগত শিষ্য একদিন বলিলেন—"তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সত্যই তাঁর ঈশ্বর"। ঠিক কথা, সত্যকে তিনি ঈশ্বর জানিয়া সেবা করিতেন। জানিতেন, সত্য-পরায়ণতা মানবের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যেখানে সত্য সেইখানেই ঈশ্বর। তিনি কি ভাবে সত্যের অনুসরণ করিতেন তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :—

একদিন গিয়া দেখি লাহিড়ী মহাশয়ের মন যেন উত্তেজিত। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—"দেখ, আমার বোধ হয় পরোক্ষভাবে পাপী হচ্চি।" প্রশ্ন—"ব্যাপারটা কি"? উত্তর—"আমাদের বাড়ীতে পীড়া আছে, মুরগী টুরগী সর্ব্বদা রাঁধতে হয়, আমি আশ্চর্য্য মনে করি আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ তা রাঁধতে আপত্তি করে না; কিন্তু সে যে বাহিরে অন্য লোকের কাছে তাহা স্বীকার করে তা বোধ হয় না; হয়ত মিথ্যা কথা বলে। আমরা ঐ গরীব লোককে প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা বলাচ্চি, এতে কি আমরা পাপী নই?" উত্তর—"বাহিরের লোকের কার বা মাথা ব্যথা পড়েছে যে আপনার বাড়ীর ভিতরে কি রাঁধে না রাঁধে তার খবর লয়। আপনার যদি মনে এতই বাঁধে তা হলে অন্য জেতের রাঁধুনী রাখতেই পারেন।" "উত্তর—আমিত তা রাখতে চাই, গৃহিণীর জন্য পারি না।"

উত্তরপাড়া স্কুলে তিনি যখন হেড মাষ্টার তখন তাঁহার চাকরাণী একদিন

শিশু নবকুমারকে ভুলাইবার জন্য বলিল—"থাম, থাম, মিঠাই দিব ;" এই বাক্যে শিশু থামিল। কিন্তু বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গিয়া চাকরাণীর হাতে পয়সা দিয়া বলিলেন, "তুমি যখন মিঠাই দেব বলেছ তখন মিঠাই এনে দিতেই হবে, তা না হলে ছেলে মিথ্যে বল্‌তে শিখবে।" এই বলিয়া চাকরাণীকে মিঠাই আনিয়া দিতে বাধ্য করিলেন।

ভাগলপুর হইতে আর এক জন বন্ধু আর একটী ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে লাহিড়ী মহাশয় তদনীন্তন প্রসিদ্ধ উকীল অতুলচন্দ্র মল্লিকের ভবনে সর্ব্বদা যাইতেন। এক দিন তিনি ভবনে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে মল্লিক মহাশয়ের ভৃত্য প্রভুর আদেশে তাঁহার নিজের জন্য গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিতেছে। লাহিড়ী মহাশয় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় ভৃত্যকে গুড়গুড়ী সরাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি অন্তর্হিত হইল। কিন্তু ঘটনাটী লাহিড়ী মহাশয়ের নেত্রগোচর হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিয়া মল্লিক মহাশয়কে বলিলেন—"তুমি তামাক কেন সরাইলে ? যদি তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ কার্য্য মনে কর, কাহারও সম্মু খাইও না ; আর যদি নিষিদ্ধ না মনে কর, সকলের সমক্ষেই খাইতে পার।" মনের কথাটা এই জগতের সহিত ব্যবহারে খাঁটি থাকিতে হইবে, রাখা ঢাকা আবার কি !

ইহার অনুরূপ তাঁহার জীবনের আর একটী ঘটনা আছে, যাহাতে যুগপৎ তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর কালেজে কর্ম্ম করিবার সময় একদিন তাঁহার দেরাজ হইতে একটী জিনিষ চুরি যায়। প্রথমে মধু নামক একজন ভৃত্যের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি মধুকে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু কালেজের লোকের নিকট সে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং মধুকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক দিন পরে, সে দ্রব্যটী আবার পাওয়া যায়। তখন লাহিড়ী মহাশয় মধুকে ডাকিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন—"মধু, অমুক জিনিষটী তুমি চুরি করিয়াছ মনে করিয়া আমি মনে মনে তোমাকে চোর ভাবিয়াছিলাম এবং অপরের নিকট সে কথা বলিয়াছিলাম, তুমি আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

ফলতঃ তাঁহার পরিবার পরিজনের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার শেষ

দশায়, কলিকাতাবাস কালে, পরোক্ষভাবে অসত্য ও অসাধুতার প্রশ্রয় দেওয়া লইয়া সময়ে সময়ে মহা অশান্তি ঘটিত। একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে; তার হাব ভাব দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের বিরক্তি বোধ হইল; পরিবারদিগকে বলিলেন—"ওর স্বভাব চরিত্র ভাল নয় ওকে কেন বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেও, ওর কাছে মাছ নিও না।" তাঁহারা হয়ত বলিলেন—"পয়সা দেব, জিনিস নেব, তার স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?" কোন ও লোক কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিয়া গিয়াছে, পরে যদি জানিতে পারিতেন যে সে ঠকাইয়া গিয়াছে বা মিথ্যা বলিয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে আর গৃহে আসিতে দিতেন না, বা তাহার নিকট কিছু লইতেন না। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলিত,—"জিনিসটার দর ত আমরা জানি, হাতের কাছে পাওয়া যাচ্চে নেওয়া যাক্, কে আবার বাজারে যায়।" তিনি বলিতেন,—"না, তা হবে না, ও অসৎ লোক, ওর সঙ্গে কারবার করা হবে না।"

আমাদের অনেকের চক্ষে এতটা করা বাড়াবাড়ি মনে হইতে পারে, কিন্তু সত্যপরায়ণতা যাঁর জীবনের মহামন্ত্র ছিল, চিরদিন সর্ব্বপ্রযত্নে যিনি সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

যাহা হউক, কলিকাতাতে তিনি বিবাদ বিসম্বাদের অতীত হইয়া, সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার এখন হইতে পিতার স্কন্ধের ভার নিজস্কন্ধে লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নবকুমারের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখিবার ভার তাঁহার উপরে পড়িয়া গেল। সহোদর সহোদরার মৃত্যু, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বার বার দেশত্যাগ, পরিবারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এইরূপ নানা প্রতিবন্ধক সত্বেও শরৎ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল, এ, পড়িবার জন্য সহরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারের এমনি অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁহার কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু এ পদ গ্রহণ করিয়াও তিনি ত্বরায় অনুভব করিলেন যে, ঐ পদের যে স্বল্প আয় তাহাতে আর কুলাইতেছে না; সহৃদয় বন্ধুগণের উপরে বার বার ভার স্বরূপ হইতে হইতেছে। তখন তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ও বৃদ্ধ

পিতা মাতার সেবার ভাল বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করা স্থির করিলেন; এবং ১৮৮৩ সালে ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যবসাতে বিশেষ উন্নতিলাভ হইবে এই আশায় তাঁহার পিতার অনুরক্ত ছাত্র ও চিরবন্ধু কোন্নগরের বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু তাঁহার উৎসাহদাতা হইলেন; এবং শরৎকুমার উক্ত ব্যবসায় এক বৎসর চালানর পর তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ণচন্দ্র বসুকে কিছু টাকা দিয়া ঐ কারবারের অংশীদার করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে লাহিড়ী মহাশয়ের নাম যে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন জানিয়া অনেক গ্রন্থকার ও অপরাপর লোক তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দেখিতে দেখিতে ইঁহাদের কারবার ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৮৫ সালের শেষে শরৎকুমারের বৈষয়িক অবস্থা এরূপ হইল, যে সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালেজের কাজ পরিত্যাগ করিয়া কারবারে আপনার সমুদয় সময় দিতে সমর্থ হইলেন; এবং ১৮৮৭ সালে পূর্ণচন্দ্র বসুর অংশ ক্রয় করিয়া আপনি সমগ্র কারবারটীর মালিক হইলেন।

এদিকে বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরিবার যে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আর থামিল না। লাহিড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার অনেক দিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। একটু বিশেষ বোধ হওয়াতে লাহিড়ী মহাশয় সপরিবারে কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, বিনয়ের ম্যালেরিয়া জ্বর আবার প্রবল আকারে প্রকাশ পাইল; আবার তাহাকে লইয়া স্থানান্তরে যাওয়া আবশ্যক হইল। এইবার তাঁহারা মুঙ্গেরে গেলেন। সেখানে তাহার পীড়ার উপশম হইল না। ঐ ১৮৮৫ সালের ২৩শে আগষ্ট দিবসে বিনয় সেখানে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। সকলে ভগ্ন-হৃদয়ে আবার কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহারা কলিকাতাতে ফিরিলে আমরা অনেকে শোক প্রকাশ করিবার জন্য লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে গেলাম। আমার স্মরণ আছে সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিলেন—"কি দুঃখের কথা, এতগুলি সন্তান চক্ষের উপর মিলাইয়া গেল।" তাহাতে সেই সাধু পুরুষ বলিলেন—"ও কথা কেন

বল? এই কথা কেন বল না আমার মত অধমকে যে তিনি এত কৃপা করিলেন যে কয়েকটী এখনও রাখিলেন এই ঢের। এগুলিকে নিলেই বা আমরা কি করিতে পারি? যা রহিল তাহার জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ। আমি অধম নিকৃষ্ট মানুষ, জগতের সুখের উপরে আমার কি অধিকার আছে?"

এই স্বর্গীয় বিনয় তাঁহার প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক গুণ ছিল। ভাগলপুরের প্রথমোক্ত বন্ধুটী লিখিয়াছেন—"রামতনু বাবু যখন উত্তরপাড়া স্কুলের হেড মাষ্টার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে, আমাকে সেখানে ভর্ত্তি করিবার প্রস্তাব হয়। আমার পিতা লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃৎ কে, এম্, বানার্জি মহাশয়ের পত্র লইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যান। বাবা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, যে কে, এম্. বানার্জির পত্র লইয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রথমে মস্তকের উপরে রাখিয়া বলিলেন, "আমার গুরুর পত্র"। যিনি একজন সহাধ্যায়ীকে এত ভক্তি করিতে পারেন, তাঁহার বিনয়ের কথা কি বলিব।"

যাহা হউক, বিনয়কুমারের শোক ক্রমে পুরাতন হইল। শরৎকুমারের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত ভাল হইল। চিন্তার ভারটা লঘু হওয়াতে সকলেরই মন অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে লাগিল। ১৮৮৭ সালের প্রারম্ভে শরৎকুমারের বিবাহ হইল। জননী নব পুত্র-বধুর মুখ দর্শন করিয়া সন্তান শোক কিয়ৎপরিমাণে ভুলিতে লাগিলেন। যথা সময়ে, ১৮৮৯ সালে নব, বধু এক কন্যার মুখ দর্শন করিলেন। কিন্তু হায়! জননী সে সুখ অধিকদিন সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার দশ বার দিন পরেই বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন।

জীবনের এতদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী যখন চলিয়া গেলেন, তখন বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার জন্য আরও দুঃখ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন।

যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রিয় বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ সালে তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার গর্ডন ইয়ংএর সহিত বিবাদ করিয়া সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। উক্ত পদ ত্যাগ করার পর গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেকগুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থের আয় হইতে মাসে মাসে তিনি অনেক টাকা পাইতেন। যেমন আয় তেমনি ব্যয়—দুই হস্তে দান। নিজের জন্য তাঁহার যৎসামান্য

বায় ছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানের ন্যায় বাস করিয়াছেন। সে জন্য নিজের উপার্জ্জিত অর্থের অধিক ব্যয় হইত না। সকের মধ্যে পুস্তকের সক ছিল। ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করা, উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান ও সযত্নে রক্ষা করা, ইহা তাঁহার শেষ দশার একটা প্রধান কাজ হইয়াছিল।

১৮৬৬ সালে যখন মিস কার্পেণ্টার এদেশে আগমন করেন। তখন তাঁহাকে লইয়া বালি-উত্তরপাড়ার কোনও বালিকা বিদ্যালয় দেখাইতে যাইবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। তদবধি তাঁহার পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিছুই ভাল করিয়া পরিপাক হইত না। তদবধি যে এত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তাহা কেবল মনের জোরে বলিলে হয়।

সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া ১৮৯১ সালের ২৮শে জুলাই ফুরাইয়া গেল। ঐ সালের ঐ দিবসে তিনি এলোক হইতে অবসৃত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া গেলে, লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয়ের আর এক গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে এতদিন ছিলেন, হঠাৎ সে বাহু কে সরাইয়া লইল! তিনি মুখে কিছু বলিলেন না, শোক প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু মর্ম্মস্থানে একটা শূন্যতা রহিয়া গেল। তাহাত অনিবার্য্য! যৌবনের প্রারম্ভে যে বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, তাহা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ছিল; ইহা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অল্প বন্ধুতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার তীব্র বিচারে পার পাইয়া চিরদিন তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা, অধিক লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই লাহিড়ী মহাশয়ের শিশু-সুলভ বিনয় ও বিশুদ্ধ সাধুতার পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

সাগরকূলে তীরদেশে জাহাজখানি একাধিক রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ থাকে; যে দিন অকূলে ভাসিবার সময় আসে, সে দিন কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দেখা যায়, এক একটী করিয়া রজ্জুর বন্ধন উন্মোচন করিতেছে। ঐ একটী রজ্জু খুলিয়া লইল, লোকে বলিল—"এইবার জাহাজ ছাড়বে"। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটী খুলিল; আবার ধ্বনি উঠিল "এই ছাড়ে রে"; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটী খুলিল, তখন মানুষ উন্মুখ, এইবার অকূলে যাত্রা করিবার সময় আসিল। লাহিড়ী মহাশয়ের যেন সেই দশা ঘটিল! যে সকল রজ্জু দ্বারা তিনি আমা-

দের এই পৃথিবীর সহিত বাঁধা ছিলেন, বিধাতা একে একে সেগুলি খুলিয়া লইতে লাগিলেন; আমরা উন্মুখ হইতে লাগিলাম এইবার অনন্তধামে যাত্রা করিবার সময় আসিতেছে। অথবা বোধ হয় আমাদেরই ভুল! তিনি কোনও রজ্জুর দ্বারা আমাদের এ জগতের সহিত বাঁধা ছিলেন না। বাস্তবিকই তিনি পদ্মপত্রের জলের ন্যায় আমাদের এ পৃথিবীতে বাস করিতেছিলেন; তাহা না হইলে কি এখানকার সুখ দুঃখের এতটা অতীত হইয়া এরূপে বাস করা যায়?

সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া যাওয়ার অল্পদিন পরেই আর এক আঘাত আসিল। ঐ ১৮৯১ সালের ৭ই অক্টোবর দিবসে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। রামতনু বাবু আপনার সহোদর ভ্রাতাদিগকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। কনিষ্ঠের পীড়া হইলে তাঁহার মন অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, এ শোক সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে না; কিন্তু ঈশ্বর যখন প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইলেন, তখনও সেই ঈশ্বরেচ্ছাতে আত্ম-সমর্পণের ভাব, সেই অপরাজিত ধৈর্য্য! কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় কিরূপ সর্ব্বজনের প্রিয় ছিলেন তাহা অগ্রে বর্ণন করিয়াছি। সেই গুণধর সহোদরের বিয়োগ-দুঃখ কিরূপ তীব্র হইবার সম্ভাবনা, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের অন্তরে যাহাই থাকুক, এ শোকও তিনি জয় করিলেন। তাঁহার ধীর স্থির প্রশান্ত ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ ভাবের কিছুই ব্যত্যয় ঘটিল না। তিনি ধীরচিত্তে নিজের প্রস্থানের দিনের অপেক্ষায় রহিলেন।

অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা দারুণ আঘাত আসিল। তাঁহার প্রাণের প্রিয় কালীচরণ ঘোষও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে কালীচরণ যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অনুরক্ত পুত্রের ন্যায়, বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই কালীচরণ যখন চলিয়া গেলেন তখন লাহিড়ী মহাশয় নিশ্চয় মনে মনে বলিয়া থাকিবেন—"হে বিধাতা, এ অধমকে আর কত দিন সংসারে রাখিবে?" আর বাস্তবিক লাহিড়ী মহাশয় সেই হইতেই যেন জরাজীর্ণ ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন।

দিন দিন পুত্র শরৎকুমারের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৯৫

সালে তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কলিকাতার হারিসনরোডে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ পিতাকে স্থাপন করিলেন; দাস দাসীর দ্বারা পরিবৃত করিয়া দিলেন; পরিচর্য্যার অবশিষ্ট রহিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতী এবং পুত্রদ্বয়, শরৎকুমার ও বসন্তকুমার, সর্ব্বান্তঃকরণে পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। বধূমাতা তদ্গত-চিত্ত হইয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! আমাদের মনে হইত লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণ যেন কিছুতেই বসিতেছে না! পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া যেন কোন দেশে যাইতে চাহিতেছে! সর্ব্বদা বাড়ীর বাহিরে যাইতে চাহিতেন; যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে দেখিতে চাহিতেন; আমাদের কাহারও না কাহারও বাড়ীতে যাইতে চাহিতেন; মধ্যে মধ্যে প্রিয়শিষ্য ক্ষেত্রমোহন বসুর বাড়ীতে গিয়া দুই এক দিন যাপন করিতেন; কিন্তু তাঁহার শরীরে বল ছিল না বলিয়া পরিবার পরিজন অনেক সময়ে যাইতে দিতেন না। ইহা লইয়া অনেক দিন বিবাদ উপস্থিত হইত।

বোধ হয় এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন যে সচরাচর লোকে নিজের প্রতি অপর লোকের ব্যবহারের কি ত্রুটী হইল তাহাই দেখে! ঐ অমুক আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহায্য করিল না, অমুক আমার খবর লইল না, ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু সাধুদের প্রকৃতি অন্য প্রকার; অপরের ব্যবহারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি তত নয়, যত নিজেদের ত্রুটীর প্রতি। আমি অমুককে দেখিলাম না, ঐ অমুকের খবর লওয়া হইল না, এই সময় অমুককে সাহায্য করা উচিত ছিল, করা হইল না, ইত্যাদি। রামতনু লাহিড়ীতে আমরা এই সময়ে তাহাই দেখিতাম। অনেক দিন গিয়াছে তাঁহাকে দেখা হয় নাই, অনুতপ্ত অন্তরে যাইতেছি, ভাবিতেছি যাঁহাকে প্রতিদিন দেখা উচিত তাঁহাকে এতদিন পরে দেখিতে যাইতেছি, মুখ দেখাইব কি করিয়া; কিন্তু যেই উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়াছি, অমনি, আর এক ভাব।—"ওহে দেখ, আমার কি অপরাধ হয়ে যাচ্ছে? মা লক্ষ্মীরা আমাকে এত ভালবাসেন, আমি যে একবার গিয়া তাঁহাদিগকে দেখে আস্‌বো, তা হয় না। তোমরা কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত তোমরা কি সর্ব্বদা আসতে পার! আমারই গিয়ে দেখে আসা কর্ত্তব্য।" মনে ভাবিলাম, হা হরি! উল্‌টো বিচার! একেই বলে শিষ্টতা! একেই বলে সাধুতা! ঠিক! ঠিক। যিনি পরের ভালটা ও নিজের মন্দটা দেখেন তিনিই সাধু।

লাহিড়ী মহাশয় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, তখনও তাঁর হৃদয়-মন্দিরের পূজিত দেবতাগুলির প্রতি সজাগ প্রেম। এই সময়ে আমরা দেখা করিতে গেলেই তিনি একটা বিষয়ে দুঃখ করিতেন, হেয়ারের স্মৃতি কেউ ভাল করিয়া রাখিল না। বলিতে গেলে তাঁহারই প্ররোচনাতে হেয়ার এনিভার্সারি কিছু কাল উঠিয়া যাওয়ার পর আবার আরম্ভ হইল। তাঁহারই প্ররোচনাতে সিটী কালেজের তদানীন্তন সুযোগ্য অধ্যক্ষ ভক্তিভাজন উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় কালেজের দিঘীর মধ্যে হেয়ারের সমাধি-মন্দিরের সন্নিকটে প্রতিবৎসর ১লা জুন দিবসে হেয়ারের স্মরণার্থ সভা আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ যাক্ না যাক্ বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়কে পালকী করিয়া লইয়া যাইতে হইত। আমরা গিয়া দেখি তিনি একখানি চেয়ার বা বেঞ্চে ভক্তি ভাবে বসিয়া আছেন। যিনি বাল্যকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া উত্তরকালে, কর্ম্ম কাজ করিবার সময়, পালকী করিয়া মাতুলের দ্বারে উপস্থিত হইতেন না, কিয়দ্দূরে পালকী ত্যাগ করিয়া পদব্রজে মাতুল ভবনে যাইতেন, তাঁহার পক্ষে শিক্ষাদাতা গুরু হেয়ারের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক। যতদিন দেহে উঠিবার শক্তি ছিল, ততদিন তিনি হেয়ারের স্মরণার্থ সভায় যাইতে ছাড়িতেন না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দেখিতে চাহিলেন। শুনিবা মাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাহক পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধে বৃদ্ধে সমাগম, প্রাচীন ভাবে প্রাচীন আনন্দ জাগিয়া উঠিল। মহর্ষি বলিলেন—"স্বর্গে দেবগণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ; তোমাকে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন।"

ইহার পর ১৮৯৮ সালের প্রারম্ভে একদিন তিনি কেমন করিয়া খাট হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন একেবারে শয্যাশায়ী হইতে হইল। ওদিকে জীবনের শক্তি দিন দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল ; দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন ; স্মৃতির ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিল ; আমরা তাঁহাকে হারাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। অবশেষে ঐ সালের ১৩ই আগষ্ট দিবসে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

"রামতনু লাহিড়ী চলিয়া গেলেন"—এই সংবাদ যখন সহরের লোকের কর্ণগোচর হইল, তখন সকল দলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের, লোকে দ্রুতপদে শরৎকুমার লাহিড়ীর ভবনের অভিমুখে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে হারিসন

রোডে, শরৎকুমারের গৃহের সম্মুখে, জনতা! আমরা উপরে গিয়া দেখি বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় চিরনিদ্রাতে অভিভূত আছেন। যে মুখ কতবার ভক্তি-অশ্রুতে সিক্ত বা ধর্ম্মোৎসাহে প্রদীপ্ত, বা পাপের প্রতি বিরাগে আরক্তিম দেখিয়াছি, সেই মুখ সেই মুহূর্ত্তে সুপ্তনীন হ্রদের ন্যায়, অথবা মাতৃ-ক্রোড়ে নিদ্রিত শিশুর মুখের ন্যায়, নিরুপদ্রব শান্তিতে পরিপূর্ণ! চাহিয়া চাহিয়া রহিলাম, মনে হইল সেই দেবশিশু জগত-জননীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। হায়! এ জীবনে কত মানুষ হারাইলাম, মানুষ আসে মানুষ যায়, সকল মানুষ ত মধুর স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে স্মৃতি রাখিয়া যায় না! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়াছি যাঁহারা যাইবার সময় প্রাণে কিছু রাখিয়া গিয়াছেন,—যাঁহারা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তরাত্মা বলিয়াছে, "হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইয়াছিলাম, এমন মানুষ আর কি দেখিব!" সে দিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিলাম, আর ভাবিলাম এই সেই দলের একজন মানুষ গেলেন।

যথা সময়ে আমরা বহুসংখ্যক ব্যক্তি নগ্নপদে তাঁহার মৃত-দেহ বহন করিয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেদিন কি কেবল শরৎকুমার ও বসন্তকুমার পিতৃকৃত্য করিতে গেল? তাহা নহে; আমরা অনেকে পিতৃকৃত্য করিতে গেলাম। পথে আরও অনেক লোক যুটিল। জনতা দেখিয়া লোকে বলে—"কে যায়? কে যায়?"—উত্তর,—"রামতনু লাহিড়ী যান?" অমনি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে একই বাণী—"যাঃ, দেশের একটা সাধুলোক গেল।" রোমের পোপ অনেক খ্রীষ্টীয় নর নারীকে সাধু উপাধি দিয়াছেন—ইঁহাকে সাধারণ লোকে "সাধু" উপাধি দিয়াছিল। ক্রমে আমরা শ্মশান ঘাটে পৌছিয়া তাঁহার নশ্বর দেহ চিতানলে অর্পণ করিলাম; অবিনশ্বর যাহা, তাহা অমৃতের ক্রোড়ে অগ্রেই আশ্রয় লইয়াছিল।

যথা সময়ে শরৎকুমার ও বসন্তকুমার বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। যে মঙ্গলময় পুরুষের প্রতি লাহিড়ী মহাশয় জীবদ্দশায় অবিচলিত আস্থা রাখিয়াছিলেন, তাঁহারই অর্চ্চনাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সভাস্থলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মিঃ কে, জি, গুপ্ত প্রভৃতি পরলোকগত সাধুর অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধস্থলে একজন বন্ধু আমাকে কাণে কাণে একটী চমৎকার কথা বলিলেন। তাহা এই—"ওরূপ চরিত্রের আলোচনা করিবার

সময় ইহা দেখিতে হইবে অপরে তাঁহাদিগকে কি ভাবে দেখিয়াছে, তাঁহাদের কোন কোন বিষয় স্মৃতিতে রাখিয়াছে। ইঁহারা অধিক কিছু না করিলেও যে স্মৃতি রাখিয়া যান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ।" ঠিক কথা! ঠিক কথা! মহাজনের সহিত সামান্য মানবের তুলনাতে যদি অপরাধ না হয়, তাহা হইলে বলি, কোটি কোটি নরনারীর পূজিত বুদ্ধ বা যীশু জগতে কি কাজ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের কাজের কথা বলিতে গেলে দুই কথাতেই শেষ হয়। কিন্তু সেখানে তাঁহাদের মহত্ত্ব নহে; লোকে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া, তাঁহাদের কাছে বসিয়া, যাহা দেখিয়াছিল ও যাহা মনে রাখিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতি তেমনি শত শত হৃদয়ে রহিয়াছে। এইমাত্র প্রার্থনা সেই স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে বাস করুক ও আমাদের চক্ষের আলোক হউক।

সম্পূর্ণ।

অতিরিক্ত

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুর পত্র

১। ইংরাজী সন ১৮৫২ সালে রামতনু বাবু উত্তরপাড়ায় ইংরাজী ইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বর্দ্ধমান ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যখন উত্তরপাড়ায় আসেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাকে বেশী বয়সের দেখাইত। ১৮৫৬ সালের শেষে এক বৎসরের অবসর লইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি সপরিবার নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে ত্বরায় তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৮৫৮ সালে কলিকাতার দক্ষিণ রসা ইস্কুলের তিনি প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখান হইতে অল্প দিন মধ্যে তিমি বরিশাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। বরিশালে প্রায় এক বৎসর কাল থাকিয়া কৃষ্ণনগর কালেজের ইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক বাসস্থান কৃষ্ণনগরে বাস করিতে লাগিলেন। এখান হইতে দুই বৎসরের অবসর লইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য ভাগলপুরে বাস করেন। সেই থান হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পেনশন পাইবার প্রার্থনা করেন। অভিপ্রায় ছিল শেষ জীবন ঐ নগরে অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত বেলেডাঙ্গা নামক পল্লিতে যে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে বাস করিতেন। পরে ম্যালেরিয়া জরের তাড়নায় ১৮৮০ সালে সপরিবার কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার লাহিড়ীর কলিকাতার বাড়ী প্রস্তুত হইলে তাহাতে দুই বৎসর বাস করিয়া তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

২। তিনি উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিযুক্ত হইবার পর নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সামান্য বেতনে ঐ ইস্কুলে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ

করিলেন। রামতনু বাবুও তাঁহার অনুরূপ সহকারী পাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাঁহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। ইস্কুলের উন্নতি সাধন জন্য তাঁহারা দুই জনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ নাই। ঐ সময়ে ইস্কুলে প্রায় ২৫০ ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের নাম, বাড়ী, অভিভাবক কে, তাঁহার অবস্থা কেমন, এ সকল সমাচার অল্প দিনের মধ্যে রামতনু বাবু অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন।

৩। আমরা যে কালে ইস্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটবল, জিমন্তাষ্টিক প্রভৃতি খেলা ছিল না। কিন্তু অঙ্গ চালনার উপযোগী অন্য প্রকার খেলা অনেক ছিল। নুণকোট আর কপাটী বেশী চলিত। ইস্কুল বসিবার পূর্ব্বে কিম্বা টিফিনের সময়ে ইস্কুল ভূমিতে খেলা হইতেছে দেখিলে রামতনু বাবু প্রায় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে হার জিতের মীমাংসা করিয়া দিতে হইত।

৪। উত্তরপাড়ার ইস্কুল বাটীর উপরতলে রামতনু বাবু থাকিতেন। নীচে ইস্কুল হইত। পাঠের সময় কোন ঘরের দরজা বন্ধ থাকিত না কিন্তু সকল কেলাশের পাঠ সুচারু রূপে চলিত। কোন কেলাশ হইতে একটু গোলমালের শব্দ তাঁহার কাণে গেলে অমনি আপন স্থান হইতে উঠিয়া সেখানে যাইয়া দাঁড়াইবা মাত্র সব সুশৃঙ্খল হইয়া যাইত। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম থাকিত না। সমস্তক্ষণ সম-ভাবে মনোযোগী থাকিতেন। ইস্কুলের বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর ভিতর রাখিতেন। ইস্কুলগৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেই বোধ হইত যে এখানে একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

৫। আহারের পর মানসিক চিন্তা অস্বাস্থ্যকর, এই জন্য ইস্কুল বসিলে ছাত্রদের প্রথমে হস্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন; এই সঙ্গে বানান শুদ্ধির কার্য্যও হইত। তিনি নিজে কি সুন্দর লিখিতেন, লেখার প্রত্যেক টান যেন তাঁহার অন্তর হইতে বাহির হইত। তাঁহার এত বয়স হইয়াছিল কিন্তু লিখিবার সময় কখনও হাত কাঁপিত না।

৬। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া আরম্ভ হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ আবৃত্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণ শুদ্ধি ও যতি চ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবৃত্তি করিতে হইত। তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে ক্রটী করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাঁহার আবৃত্তি-গুণে আমাদের বোধ

গম্য হইয়া যাইত। আবৃত্তির পর পাঠের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। শব্দের প্রতি-শব্দ বলিতে পারিলে ব্যাখ্যা হয় না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের অর্থ বলা হইত। তার পর প্রশ্ন দ্বারায় লেখকের ভাব ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের আনুসঙ্গিক যাহা কিছু থাকিত সে সমস্ত আলোচিত হইত। সময়ে সময়ে এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইত যে অবশেষে চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে হইত আমরা কোন কোন পথ দিয়া পর্যাটন পূর্ব্বক পাঠ্য বিষয় হইতে এত দূরে বিচরণ করিতেছি। এমন করিয়া পড়িতে গেলে বেশী পাতা শায় হয় না।

৭। ছাত্রেরা যাহাতে আপন যত্নে শিখে, যাহাতে লেখাপড়ার প্রতি তাহাদের সুরুচি জন্মে এবং যাহাতে তাহারা শিক্ষার ফল কার্য্যে পরিণত করিতে পারে এই সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন তোমাদের মনঃসিংহকে উত্তেজিত করিতে পারিলে আমার কার্য্য সফল হয়। পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত ইংরাজী কবি বরণস, কাউপর, টমসন, এবং ক্যাম্বেল হইতে কতগুলি সুন্দর ও সরল কবিতা বাছিয়া আমাদের পড়াইতেন। মিল্‌টনের কোমস হইতে অনেক অংশ পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা যাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় যত্নশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন কবিতা আরম্ভ করিতেন তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইত; এবং হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ হইত। তাঁহার সঙ্গে আমাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। কতদিন বোধ হইত টিফিনের ঘণ্টা বড় শীঘ্র বাজিয়া গেল। ছাত্রদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল। যেন সকলের মন সূত্রে গাঁথিয়া আপনার হাতের ভিতর ধরিয়া রহিয়াছেন। আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ এই শক্তির মূল। উত্তর পাড়ার ইস্কুলগৃহে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর ফলকে তাঁহার জনৈক ছাত্র অতি বিশদ ভাবে তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকাশিত করিয়াছেন।

৮। তাঁহার অধ্যাপনার অনুরূপ বিবরণ, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে বলিয়া সেই ছত্রগুলি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আরনল্ড সাহেবের জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিলাম;—

"Every pupil was made to feel that there was work for him to do—that his happiness as well as his duty lay in doing that work well. Hence an indescribable zest was communi-

cated to a youngman's feeling about life : a strange joy came over him on discovering that he had the means of being useful, and thus of being happy ; and a deep respect and ardent attachment sprang up towards him who had taught him thus to value life and his own self and his work and mission in this world. All this was founded on the breadth and comprehensiveness of Arnold's character as well as its striking truth and reality ; on the unfeigned regard he had for work of all kinds, and the sense he had of its value both for the complex aggregate of society and the growth and perfection of the individual. রামতনু বাবুকে বঙ্গদেশের আরনল্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৯। ছাত্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সহিষ্ণু ছিলেন। যদি ছাত্র প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাহার শত দোষ ক্ষমা করিতেন। কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না; বরং দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহার কথা মিথ্যা কিম্বা প্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে তাঁহার বিরক্তির সীমা থাকিত না।

১০। অধ্যাপনা এবং অধ্যয়ন যে কি গুরুতর কার্য্য তাঁহার অনুগ্রহে আমরা তখন যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তখন যে একটী শ্রেষ্ঠতম কার্য্যে আমরা নিযুক্ত ছিলাম এবং এই কার্য্য সম্পাদনের উপর আমাদের ভাবী জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিবে এই জ্ঞানও তাঁহার কৃপায় কতক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম।

১১। এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্ত্তমান ছিলেন। বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোয়ালিয়াতে হরগোবিন্দ সেন এবং হাওড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইঁহারা রামতনু বাবু অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপনায় তাঁহারা কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন কি না তাহা সন্দেহ। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার বড় গুণগ্রাহী ছিলেন।

১২। রামতনু বাবুর অধ্যাপনা শ্রেষ্ঠতম হইবার আর একটী কারণ ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সর্ব্বদা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ

চেষ্টা করিতেন। তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভের জন্য যে প্রকার অধ্যবসায় ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি জীবনের উৎকর্ষ সাধন জন্য ততোধিক করিতেন। নিরন্তর এই উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল; এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার এই আশার নিবৃত্তি হয় নাই।

১৩। হিন্দু কালেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কালেজে প্রথমে তিনি শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সমপাঠীরা বড় বড় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনিও ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের মত কার্য্য পাইতেন। কিন্তু স্বদেশে উত্তম শিক্ষকের কি গুরুতর অভাব তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে, তাহা মোচন করিবার জন্য ধন মানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করেন; এবং কায়মনোচিত্তে এই কার্য্য চিরজীবন সাধন করিয়াছিলেন।

১৪। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি অধ্যাপনার যে আদর্শ দেখাইয়া যান তাহার কিয়দংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

১৫। রামতনু বাবু দীর্ঘাকার কিম্বা খর্ব্বাকার পুরুষ ছিলেন না, যৌবন-কালে বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অকালে তাঁহার শরীর শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের হাত টিপিয়া বলিতেন, baby bones! তাঁহার যৌবনকালের যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে না, যে ইহা তাঁহার ছবি, কারণ ঐ ছবিতে তাঁহার বদনমণ্ডল উপর নীচে লম্বা দেখায়। কিন্তু আমরা কখন তাঁহার ওরূপ চেহারা দেখি নাই। আমরা যত দিন দেখিয়াছি তাঁহার মুখমণ্ডল গোলাকার দেখিয়াছি। চেহারার এত পরি-বর্ত্তন অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে ঘটিয়াছে কি না বলিতে পারি না। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার একখানি ছাপার ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাকে যত স্থূলাকার দেখায় বস্তুত তিনি তত স্থূলাকার ছিলেন না।

১৬। শরীর রক্ষার জন্য তিনি সাতিশয় যত্নবান ছিলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেন ঈশ্বর যাহা কৃপা করিয়া দিয়াছেন তাহা অবহেলা করিয়া কেন হারাইব। এই যত্নের গুণে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং কোন প্রকার পীড়ায় কখনও কষ্ট পান নাই। আহারাদি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন এবং খাদ্য সামগ্রীর দোষ গুণ বিবেচনায় বড় বিচক্ষণ ছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল সবল ছিল। তাঁহার দাঁত একটী বই পড়ে নাই। শ্রবণশক্তি এমন সুশিক্ষিত ছিল যে কোন শব্দের উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম হইলে বোধ হইত

যেন তাঁহার কর্ণকুহরে আঘাত লাগিল। বৃদ্ধ বয়সে বালকের ন্যায় নিদ্রা যাইতেন। রাত্রিতে কেমন ঘুমাইয়াছিলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাস্‌তে হাস্‌তে বলিতেন একবারও পাশ ফিরিতে হয় নাই।

১৭। যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতেন কখন নিষ্কর্ম্মা থাকিতেন না; কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। পত্র লেখা, Diary লেখা, অভ্যাগত বন্ধুগণের সহিত আলাপ করা, শিশুসন্তানদের সহিত খেলা এবং কাক ও চড়াই পাখীদের রুটীর টুকরো খাওয়ান, এমনতর একটা না একটা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। যদি কোনও কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইতেন তবে বন্ধুগণের বিষয় চিন্তা করিতেন। ৺রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার সহধ্যায়ী বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহিত গাঢ় হৃদ্যতা ছিল। শুনিয়াছি যে রামগোপাল বাবুর মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত মহোদয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্মানার্থ যে সভা হয় তাহাতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে রামতনু বাবুর বক্তৃতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক নামক তাঁহার অন্য এক বন্ধুর উপর তাঁহার সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় দেখিতেন এবং তাঁহার শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না।

১৮। এত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বড় আমায়িক ভাব ছিল। তাহাদের নাম, বাড়ী আর কি উপলক্ষে কোন স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এত সমাচার কি করিয়া তাঁহার মনে থাকিত বলিতে পারি না। একদিন দুই তিনটী ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাহাদের দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন তোমাদের চিনিয়াছি কিন্তু নাম মনে পড়ে না। তোমরা বরিশাল স্কুলে কোন কেলাসে পড়িতে। তাঁহারা বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রায় ২৭ বৎসরের পর তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

১৯। তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ থাকিত দেখিলে বোধ হইত যেন আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে, হৃদয়ে ধরে না। সংসারিক বেদনা তাঁহার ভাগ্যে কিছু কম পরিমাণে পড়ে নাই। অভিভূত করা দূরে থাকুক উহা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। আমি দূরে থাকিলে আমাকে পত্র লিখিতেন; একখানি চিঠির কাগজ লইয়া তাহাতে প্রত্যহ খানিক খানিক লিখিতেন। চারি পৃষ্ঠা পূর্ণ না হইয়া গেলে পত্র ডাকে দিতেন না। এমন এক

পত্রে এই সমাচার পাইলাম—Poor Nabacoomar died yesterday. পত্রখানি কয়েকদিন ধরিয়া লিখিতেছিলেন। একদিনের বিবরণে ঐ কথা লেখা ছিল। তাহার পর দুই একদিনের বিবরণ লিখিয়া পত্রখানি ডাকে দেন। নবকুমার তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২০। ইংরাজি সাহিত্যের তিনি একজন উচ্চতর গুণগ্রাহী ছিলেন। ইদানীং নিজে পুস্তক পড়িতে পারিতেন না। পড়িয়া শুনাইলে বড় সুখী হইতেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পুস্তক তাঁহার নিকট আদরণীয় ছিল। কোন মহৎ ভাব অথবা অসাধারণ সাহস কিম্বা অধ্যবসায়ের বিবরণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত হইয়া বসিতেন ; তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত ; এবং সেই স্থানটী পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিতেন। সময়ে সময়ে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে আর শুনিতে পারিতেন না, পাঠ করা বন্ধ করিতে হইত।

২১। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে এক দিন তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। সাক্ষাৎ করিতে গেলে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেন তাহা করিলেন না। দুর্ব্বলতা বশতঃ ঐরূপ কাতর হইয়াছিলেন। কি প্রকারে এ জড়তা আশু নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া আমেরিকার স্বাধীনতা সম্বন্ধে চ্যাটাম সাহেবের বিখ্যাত বক্তৃতার প্রথম বাক্যটী আবৃত্তি করিলাম। শুনিবা মাত্র তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং পরবর্ত্তী দুই তিনটী বাক্য নিজেই আবৃত্তি করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ; পরে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ের কথা কহিয়া বিদায় দিলেন।

২২। রামতনু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বেলেডাঙ্গার বাটীতে কয়েকবার গিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ৺কালীচরণ লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয় ও তাঁহার মাতুলপুত্র ৺কার্ত্তিকচন্দ্র রায় দেওয়ান মহাশয় দুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহারা কি অমায়িক লোক ছিলেন! চিকিৎসা সম্বন্ধে ও প্রদেশে কালীচরণ বাবুর এমন সুখ্যাতি ছিল, যে লোকে ভাবিত তাঁহার দর্শন পাইলেই রোগীর অর্দ্ধেক রোগ আরাম হইয়া যায়। দেওয়ান মহাশয় যেমন সুশ্রী ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন। অনেক যত্ন সহকারে তিনি গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার গলাও বড় মধুর ছিল। অনুরোধ করিতেই তিনি গান শুনাইতেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার ন্যায় প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরল। কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺ হরিতারণ ভট্টাচার্য্য

মহাশয় রামতনু বাবুর একজন ছাত্র ও পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি পুত্রের ন্যায় রামতনু বাবুর সমস্ত অভাব মোচন করিতে সাধ্যমত ত্রুটী করিতেন না। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। তিনি হৃদ্গত আনন্দভরে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

২৩। রামতনু বাবু কোন প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; এবং জীবনের প্রত্যেক কার্য্য তাহারই কার্য্য মনে করিয়া সম্পাদিত করিতেন। উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান অথবা সময় ছিল না। তাঁহার উপাসনার মর্ম্ম—

... ... But I lose
Myself in Him, in light ineffable!
Come then, expressive silence, muse His praise.

২৪। যখন উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিযুক্ত হন তাহার পূর্ব্বে তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে সামান্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। একদিকে পিতামাতা, কুটুম্ব স্বজন এবং সমাজ; অপরদিকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম। দুই দিকেই গুরুতর টান। একটী টান ছিন্ন না করিলে আর রক্ষা নাই। এই সঙ্কটে পড়িয়া কোনদিক আশ্রয় করিবেন তাহা স্থির করিতে, তাঁহাকে কি দারুণ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কারণ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সমাজ-বন্ধন অতিশয় দৃঢ় ও নিষ্ঠুর ছিল। কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহারে চুলমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে, তিনি অপর সাধারণ সকল লোকের বক্র দৃষ্টিতে পড়িতেন। এমন সময়ে কর্ত্তব্যের উপরোধে, পিতামাতা ও সমাজের টান ছিঁড়িয়া সর্ব্বত্র উপহাসাস্পদ হইয়া, কুটুম্ব স্বজনের চক্ষুঃশূল হইয়া এবং দাস দাসী বর্জ্জিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা, অসীম সাহসের কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। এমন সংগ্রাম সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহাদের ঘটে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া মৃতপ্রায় হইয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। অনেকে সন্ধি স্থাপন করিয়া কৃত্রিম শান্তিলাভে প্রবোধিত হন। অবশেষে অনেক মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিয়া রামতনু বাবু সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন। সত্যের এবং কর্ত্তব্যের জয় হইল, তিনিও শান্তিলাভ করিলেন।

২৫। যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা তাঁহার ইষ্টমন্ত্রের অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছিল। "Do what is right and leave the rest to God." এই মন্ত্রের উচিত কার্য্য তাহার জীবনের প্রতিদণ্ডে সম্পাদিত হইত।

২৬। প্রকাশ্যে তাহার জীবন যেন একটী তরঙ্গ-শূন্য স্রোতস্বতী মৃদুমন্দ গমনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কিরূপ দারুণ সংগ্রাম চলিয়াছিল, কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা অথচ সহিষ্ণুতা সহকারে, তিনি মনোবৃত্তি সকলের প্রশমন করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বথা কর্ত্তব্যের পথে প্রণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। অন্তরে এরূপ আলোড়িত হইয়াও, তিনি সর্ব্বদা বালোচিত আনন্দ ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে ধ্রুবতারার ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া, চির-জীবন ইষ্টমন্ত্রের সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

২৭। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার জীবনচরিতের সামান্য আভাস মাত্র। আক্ষেপের বিষয় এই যে ইঁহার মহত্ত্বের সহস্রাংশের একাংশও বুঝিতে পারি-নাই এবং যৎকিঞ্চিৎ যাহা অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহার শতাংশের এক অংশও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

২৮। যখন দেশে পুরাতন কুপ্রথা সকল তিরোহিত হইবে, যখন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সকল ঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, তখন "we shall turn our eye again, and to more purpose, upon this passionate and dauntless soldier of a forlorn hope, who, * * * * * * * * * * * waged against the conservation of the old impossible world so fiery battle; waged it till he fell,—waged it with such splendid and imperishable excellence of sincerity and strength."

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু দাস।

কলিকাতা সন ১৩১০ সাল, ৩০এ কার্ত্তিক।

FROM

AULD LANG SYNNE—SECOND SERIES

BY THE RIGHT HON. PROFESSOR MAX MULLER:

RAMTONOO LAHIRI

Ramtonoo* was born in 1813, and must therefore have been older than Debendranath Tagore, who is generally considered as the Nestor of the Brahma-Samaj.

He was a pupil of David Hare, who had undertaken the philanthropic work of educating native youths, and after spending a few years at his school, he was admitted into the Hindu College at Calcutta, which was established in 1817 as the first fruit of the annual vote of £10,000 for educational purposes insisted on by the English Parliament. The teacher who chiefly influenced the youngmen was D. Rozario, who, though branded by the clergy as an infidel and as a devil of the Thomas Paine school, was worshipped by his pupils as an incarnation of goodness aud kindness. It was Christian morality, as preached by D. Rozario, that appealed most strongly to the heart of Ramtonoo and his fellow-pupils, many of them very distinguished in later life, the fathers and grandfathers of the present generation of Indian reformers. Ramtonoo became a model among his friends in all matters pertaining to morality and conscience, penitence and sincerity being the watchwords of his early career, vice and hypocrisy the constant objects of his denunciation, both among his equals and among those of higher rank and authority. Even the founder of the Brahma-Samaj did not escape his reproof, on account of what he considered want of moral courage to act up to his convictions. As to himself, he denounced caste as a great social and moral evil, and silent submission to superstitious customs as reprehensible weakness. In order to shame those who denounced beef-eating as sinful, he and his friends would actually parade the streets with beef in their hands, inviting the people to take it and eat it. The Brahmanical thread which was retained by the members of the Brahma-Samaj as late as 1861, was openly discarded by him as early as 1851. And we must remember that in those days such open apostasy was almost a question of life or death, and that Rammohun Roy was in danger of assassination in the very streets of Calcutta. It is true that

* Ramtonoo is probably meant for Ramtanu, body of Rama, but when a name has once become familiar in the modern Bengali form, I do not always like to put it back into its classical Sanskrit form.

European officials respected and supported Ramtonoo, but among his own countrymen he was despised and shunned. However, he continued his career undisturbed by friend or foe, and guided by his own conscience only. Poor as he was, he desired no more than to earn a small pittance as a teacher in public and private schools. Later in life he was attracted to the new Brahma-Samaj, and became a close friend of Keshub Chunder Sen. When he saw others who spent much time in prayer he considered them as the most favoured fo mortals, for pure and coscientious as he was, he felt himself so sinfur that he could but seldom utter a wordor two in the spirit of what he considered true prayer before the eyes of the Lord. While cultivating his little garden hore was found lost in devotion at the sight of a full-blown rosee and while singing a hymn in adoration of God, his whole c,ountenance seemed to beam with a heavenly light. One of his friends tells us that one morning early he rushed into his room like a madman and dragged him out of bed, saying that when the whole nature was ablaze with the light and fire of God's glory, it was a shame to lie in bed. He took the sheeper to the next field, and pointing his fingers to the rising sun and the beautiful trees and foliage, he recited with the greatest rapture—what? Not a hymn of the Veda but some verses from Woadsworth. When his end approached, his old friend Debendraah Tagore went to take leave of him, and when he left him, hecried: "Now the gates of heaven are open to you, ana the gods care waiting with their outstretched arms to recerve you to the glorious region." Did not old Vedantist really say "the gods"? I doubt it, unless he used the language of Maya, as we also do sometimes, knowing that his friend would interpret it in the right sense. I see, however, that Mozoomdar also speaks of his spirit reposing in his God—showing how the old habits of thought and old words cling to us and never lose their meaning altogether.

Many more names might be mentioned, but to us they would hardly be more than names. Debendranath Tagore is the only one left who could give us a history of that important religious movement in India, and of the principal actors in it. But he is too old now to undertake such a task. The others, to use the language of their friends, have, like the stars that rise in the Eastern sky, after completing their appointed journey, sunk below the visible horizon of death, to pass from the hemisphere of time to that of eternity! But though their names may be forgotten, their good works will rema in for "Good deed," as they say in India, "never dies."

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী।

প্রতি ভক্তি ৩৫১, গোবরডাঙ্গা নাবালক জমীদারপুত্রগণের অভিভাবকতা ৩৫৩, খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের মন্তব্য ৩৫৩, ভ্রাতষ্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ ৩৫৪, ভগবদ্ভক্তি ৩৫৫, সকলের প্রতি ভালবাসা ৩৫৬, বিচারপতি ফিয়ারের সহিত মিত্রতা ৩৫৬, স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহ, চরিত্রের প্রভাব ৩৫৭, ভক্তিভাব, ৩৫৮, স্পষ্টবাদিতা ৩৫৮, সদ্‌গুণগ্রাহিতা ৩৫৯, জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমারের দারুণ পীড়া, ৩৬০, স্বাস্থ্যভঙ্গ, পরিবারবর্গের পীড়া ৩৬১, জামাতা ডাঃ তারিণীচরণের আত্মহত্যা, ৩৬২, নবকুমারকে ভাগলপুরে প্রেরণ, কন্যা ইন্দুমতী দেবীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু, ৩৬৫, বিপদে ও শোকে ধীরতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমারের মৃত্যু ৩৬৬, সাধুপুরুষের লক্ষণ, শোকজয় ৩৬৭, কৃষ্ণনগরের যুবরাজের অভিভাবকতা গ্রহণ ও নানা কারণে পরিত্যাগ, কলিকাতায় আগমন, ৩৬৯; অর্থকষ্ট, সুযোগ্য ছাত্র কালীচরণ ঘোষের সদাশয়তা ও সাহায্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব, ৩৭২, দ্বিতীয়পুত্র শরৎকুমারের পাঠ পরিত্যাগ, বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক মেট্রপলিটান কলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্তি, ৩৭৩; লাহিড়ী মহাশয়ের বাক্যে ও কার্য্যে সত্যপ্রিয়তা ৩৭৫,৩৭৬; শরৎকুমারের পুস্তকের ব্যবসা অবলম্বন ৩৭৮; কনিষ্ঠপুত্র বিনয়কুমারের ম্যালেরিয়া জর। তাহাকে লইয়া ভাগলপুরে গমন, তথায় তাহার মৃত্যু, ৩৭৮, ভগ্নহৃদয়ে কলিকাতা আগমন, ৩৭৮; স্বাভাবিক বিনয় ৩৭৯; শরৎকুমারের বৈষয়িক উন্নতি ও বিবাহ ৩৭৯, কনিষ্ঠ কালীচরণের মৃত্যু ৩৮১, পুত্রাধিক শিষ্য কালীচরণ ঘোষের মৃত্যু, ৩৮১; শিষ্টাচার ও ভদ্রতা ৩৮২, হেয়ার সাহেবের প্রতি ভক্তি ৩৮৩, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ, পদভগ্ন, শেষদশা, স্বর্গারোহণ ৩৮৩, লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ৩৮৪।

নির্ঘণ্ট।

SP 1/14
BENG ... 26 MAY 19..
...S' BUILDINGS